ভারতের সমাজ-কাঠামো

ও

উন্নয়ন-পন্থা

নীহারকুমার সরকার

পরিবেশক

পুথিঘর প্রাইভেট লিমিটেড

২২, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ—নভেম্বর, ১৯৭৬

৬, শিবু বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬, তাপসী প্রিণ্টার্স হইতে
লীলা ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও ২০৬, বিধান সরণি, কলিকাতা-৭০০০০৬,
বুক কনসার্ন হইতে অনিল ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত।

সূচীপত্র

ভূমিকা

ভূমিকা

ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা লাভ করে। তারপর থেকে আজ প্রায় ত্রিশ বছর হতে চলল। এই ত্রিশ বছরে ভারতের অনেক বিষয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে। ইংরেজ আমলে আমাদের দেশের উৎপাদন ক্ষমতা ইংরেজদেরই স্বার্থে ব্যবহৃত হত। ফলে এই উৎপাদন ক্ষমতা বেশী বাড়তে পারেনি। পাছে ব্রিটিশ কারখানার বাজার নষ্ট হয়ে যায় এই ভয়ে ভারতবর্ষে কলকারখানার বিস্তার করতে ইংরেজরা নারাজ ছিল। দেশ স্বাধীন হবার পর উৎসাহের সঙ্গে দেশে কারখানা তৈরি স্বরু হল। দেখতে দেখতে ভারতবর্ষের শহরগুলোতে অসংখ্য কারখানা গড়ে উঠল এবং ঐসব কারখানায় নানারকম জিনিসপত্র উৎপন্ন হতে লাগল। নীচের তালিকা হতে দেখা যাবে যে মোট কারখানা শিল্পের উৎপাদন ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৭৩ সালের ভেতর শতকরা ৮৪ ভাগ বেড়েছে। অনেক নূতন নূতন শিল্প গড়ে উঠেছে, যা দশ বছর আগেও আমরা ভাবতে পারতাম না। যেমন, ১৯৫৬ সালে মাসে মাত্র ১১০টা হারে ট্রাক্টর তৈরি হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে তৈরি হয় ২,৪১৪টা। ১৯৫১ সালে ডিজেল ইঞ্জিন তৈরি হয়েছিল মাসে ৬০৪টা; ১৯৭৪ সালে হয় ৯,৩৪৬টা। ১৯৫১ সালে মোটরগাড়ী ও জিপগাড়ী তৈরির হার ছিল মাসে ১,০৩২টা; ১৯৭৪ সালে হয় ৩,৯০১টা।

কারখানা শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির হার

	শিল্পের নাম	১৯৬১ থেকে ১৯৭৩ সালের ভেতর শতকরা বৃদ্ধির হার
১।	যন্ত্রশিল্পের উৎপাদন	শতকরা ৩
২।	জুতা ও পোষাক পরিচ্ছদ তৈরি	„ ৪৬
৩।	কর্ক ও কর্কের জিনিসপত্র	„ ১৪৪

শিল্পের নাম		১৯৬১ থকে ১৯৭৩ সালের ভেতর শতকরা বৃদ্ধির হার
৪। কাগজ ও কাগজের জিনিসপত্র	শতকরা	১১৩
৫। চামড়া ও চামড়ার জিনিসপত্র (জুতা বাদ দিয়ে)	„	৪৫
৬। রবার ও রবারের জিনিসপত্র	„	১১৪
৭। রাসায়নিক দ্রব্য	„	১২৩
৮। খনিজ দ্রব্য (ধাতু বাদ দিয়ে)	„	৯৪
৯। মৌলিক খনিজ ধাতু	„	৭৬
১০। ধাতুর জিনিসপত্র (যন্ত্রপাতি বাদ দিয়ে)	„	১০৮
১১। যন্ত্রপাতি (বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বাদ দিয়ে)	„	২০৮
১২। বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রপাতি	„	২৬৮
১৩। যাতায়াতের সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	„	৫
১৪। অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য		৮৪
	গড়ে শতকরা	৮৪

তেমনি দেশে উচ্চ শিক্ষাও খুব বেড়েছে। অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণার জন্য বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়া হয়েছে। ছাত্র-সংখ্যাও খুব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সরকারী ও বে-সরকারী চাকরির সংখ্যাও বেড়েছে। বড় বড় শহরের পত্তন হয়েছে এবং সেই সব শহরে সুন্দর সুন্দর বাড়ী তৈরি হয়েছে। দেশে রাস্তা-ঘাটও বেড়েছে, রেললাইনও অনেক বাড়ান হয়েছে; ফলে যাতায়াতের অনেক সুবিধা হয়েছে।

এই রকম নানা বিষয়ে দেশের উন্নতি হলেও সাধারণ গরীব চাষী, দিনমজুর ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের অবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি। কিন্তু ধনী শ্রেণীর জীবনযাত্রার আড়ম্বর খুবই বেড়েছে। ফলে গরীব লোকের অভাব অনটন ঠিক সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দেশে গরীবের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক পণ্ডিতেরা দেশে কত গরীব আছে তা নির্ধারণের জন্য একটা মাপকাঠি তৈরি করেছেন। জীবন-ধারণের জন্য যতটুকু খাওয়া-পরা দরকার, যা না হলে মানুষ কাজ করবার ক্ষমতা বজায় রাখতে পারে না, তাদের শরীর ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে, সেই পরিমাণের খাওয়া-পরার জন্য যে খরচাটা হয় সে খরচাটাকে বলা রয় "গরীবির সীমারেখা।" যাদের আয় এই সীমারেখা থেকে কম তাদের তারা গরীব শ্রেণীভুক্ত করেন। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতের গ্রামের লোকদের মধ্যে এই সীমারেখার মান ধরা হত মাথাপিছু মাসিক ১৫৲ টাকা। যাদের মাসিক আয় মাথাপিছু ১৫৲ টাকার কম তাদের বলা হত গরীব। ১৯৬০-৬১ সালে এই গরীবের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩১ জন। ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতবর্ষে গরীবের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ৪৫ জনে এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে তা দাঁড়ায় শতকরা ৫৪ জনে। অর্থাৎ ভারতবর্ষে গ্রামে গরীবের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে চলেছে। ১৯৬০-৬১ সাল থেকে আরম্ভ করে আট বছরের ভেতর গরীবদের সংখ্যা মোট লোকসংখ্যার তিন ভাগের একভাগ থেকে অর্ধেকের বেশী হয়ে গেছে। ১৯৭৫-৭৬ সাল পর্যন্ত গরীবি বৃদ্ধির হার আরও তাড়াতাড়ি বেড়েছে। কারণ অনাবৃষ্টি ও মুদ্রাস্ফীতির জন্য জনসাধারণ আরো বেশী হারে গরীব হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, বর্তমানে গ্রামের লোকদের ভেতর তিন ভাগের দুভাগই গরীব হয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া যায়। শহরের লোকদের অবস্থাও গ্রামের লোকদেরই মত। ১৯৬০-৬১ সাল থেকে ১৯৬৮-৬৯ সালের ভেতর শহরে দরিদ্রের সংখ্যা শতকরা ৩২ থেকে বেড়ে ৪১-এ দাঁড়িয়েছে।[১]

১। এই হিসাবের বিস্তৃত বিবরণ প্রণব বর্ধনের ও অন্যান্য অর্থনীতি-বিদ্‌দের লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধে পাওয়া যাবে। টি. এন. শ্রীনিবাসন ও পি. কে. বর্ধনের সম্পাদিত বই **Poverty and Income Distribution in India**, ১৩০-১৩২ পৃষ্ঠা দেখুন।

গরীবির এই পরিমাপ অবশ্য সবচেয়ে নীচু স্তরের লোকদের পরিমাপ। সমাজে এর থেকে যারা একটু ভাল অবস্থায় আছেন তাঁরা যে দারিদ্র্যের কষ্ট থেকে মুক্ত তা নয়। মোটামুটি ভাবে বলা চলে, ভারতবর্ষে শতকরা পাঁচজন লোক ছাড়া আর সবাই অল্পবিস্তর দারিদ্র্যের জ্বালায় ও খাওয়া-পরা বা উপার্জনের দুশ্চিন্তায় জর্জরিত।

এইভাবে একদিকে যেমন জনসাধারণ ক্রমেই দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে, তেমনি আবার সমাজের আর একটা স্তর ক্রমেই ফেঁপে ফুলে উঠছে। শহরে সুন্দর সুন্দর বাড়ী গাড়ী যেমন বেড়েছে তেমনি শহরের সীমানা ঘিরে বস্তিগুলোও বেড়েছে এবং সেখানে গ্রাম থেকে নিরুপায় মানুষেরা দলে দলে এসে কোন মতে জীবনধারণ করে আছে।

গ্রামের ভেতরেও গরীব চাষী ও ক্ষেত-মজুরদের জীবন আরও বেশী কষ্টকর হয়ে পড়ছে। রাজা-মহারাজারা ও বড় বড় জমিদারেরা বিদায় নিয়েছে বটে, কিন্তু তাদের জায়গায় ছোট ছোট জমিদার, জোতদার ও বড় চাষীরা গরীব-চাষী, ভাগচাষী ও ক্ষেত মজুরদের উপর শোষণের বোঝা আরও বেশী করে চাপিয়ে দিচ্ছে। ফলে স্বাধীন ভারতে একদিকে উঁচু শ্রেণীর লোকদের ধনদৌলত ও আরাম যেমন বাড়ছে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের গরীব চাষী, ক্ষেত মজুর এবং শহরের শ্রমিক ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দারিদ্র্য,—কষ্টের বোঝা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। এই দুই বিপরীত ফল ফলবার কারণ ভারতের আদিম স্তর-বিভক্ত সমাজের উপর এক দূরদৃষ্টিহীন অদ্ভুত উন্নয়ন-কৌশল চাপানো।

ভারতের সমাজ বহু প্রাচীন কাল থেকেই জাতিভেদ প্রথার ফলে উঁচু-নীচু স্তরে ভাগ করা ছিল। ব্রাহ্মণ্য যুগের পর বৌদ্ধ যুগ ও মুসলমান আমলে সমাজে অর্থনৈতিক অবস্থার কিছু কিছু রূপান্তর হলেও বর্ণগত স্তরবিভাগ বরাবরই বজায় রয়ে গেছে এবং উচ্চবর্ণের লোকেরা নীচু বর্ণের লোকেদের আগের মতই শোষণ

করে এসেছে। ইংরেজ আমলেও জাতিভেদ প্রথার কোন পরিবর্তন হল না, বরং প্রাচীন জাতিগত স্তরবিভাগের ফলে সমাজে যে শোষণ ছিল তা এই সময়ে আরো প্রবল হয়েছে, কারণ সমাজের উচ্চবর্ণের লোকেরাই ইংরেজের সহায়ক হয়ে ইংরেজকে দিয়ে এই শোষণের বনিয়াদটি আরো পাকা করে নিয়েছে। মনে রাখতে হবে, ইংরেজের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার সময় ভারতীয় সমাজের জাতিভেদজনিত এই শোষণযন্ত্রটিও আমরা লাভ করেছি।

বর্তমানে এই স্তর-বিভক্ত সমাজের উন্নতির জন্য ভারত সরকার উৎপাদন কাঠামোর এক অংশ পুঁজিপতিদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন এবং আর এক অংশ নিজেদের হাতে রেখেছেন। এই ধরনের "খিচুড়ি-পন্থায়" দেশের উন্নতি করতে গিয়ে শুধু ধনী শ্রেণীর হাতেই সমস্ত উন্নতির ফল গিয়ে জমা হল আর দরিদ্র জনসাধারণ আরও বেশী গরীব হয়ে পড়ল। এই খিচুড়িপন্থা অনুসারে যতরকম কৌশলই নেয়া হয়েছে, বা টাকা খরচ করা হচ্ছে, সবগুলোরই একই ফল দাঁড়িয়েছে—ধনী শ্রেণীর হাতে সেগুলি গরীবকে শোষণের যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে সমবায় সমিতি স্থাপন করবার চেষ্টা, গ্রাম-উন্নতির চেষ্টা, সমাজ উন্নতির চেষ্টা (Community Development Programme), পঞ্চায়েত গঠন করার চেষ্টা ইত্যাদি যত রকম চেষ্টাই আজ অবধি হয়েছে, সব চেষ্টাই গ্রামের ধনী বা উঁচু-শ্রেণীর লোকদের হাতে পড়ে গরীবদের শোষণের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে।

ভারতবর্ষের সমাজ যে গভীরভাবে স্তরে স্তরে ভাগ করা এবং উঁচুস্তরের লোকেরা যে নীচুস্তরের লোকদের উপর যুগ যুগ ধরে শোষণ চালিয়ে আসছে আমাদের দেশের বেশীর ভাগ অর্থনীতিবিদ্ ও শিক্ষিত সমাজ তা ভুলে গেছেন। ভুলে যাওয়া স্বাভাবিকও; তাঁরা নিজেরা বেশীর ভাগ উঁচু শ্রেণী থেকে এসেছেন, কাজেই শ্রেণী-স্বার্থ অনুযায়ী তাঁদের চিন্তাধারাতে এই স্তরবিভেদ যে ধরা পড়বে

না তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশের অর্থনীতিবিদ্‌রা বেশীর ভাগই ইউরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষিত। সেজন্যে তারা ভারতের এই স্তর বিভাগের গুরুত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কারণ বিদেশের সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষকরা বেশীর ভাগই তাঁদের দেশের স্বার্থে সৃষ্ট মতবাদ ভারতের ছাত্রদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ভারতীয় ছাত্ররা দেশে এসে অন্ধভাবে ঐসব শিক্ষা কাজে লাগান। অবশ্য এই ছাত্রদের শ্রেণীস্বার্থও এই শিক্ষার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকে। তার জন্য বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদী মতবাদ অনুযায়ীই তারা দেশের উন্নতির কৌশলের কথা ভাবেন। তাতে দেশের ৯৫ ভাগ গরীব লোকদের যে সর্বনাশ সাধন হবে, সে কথা তাঁরা একবার মনেও আনেন না।

দেশের বেশীর ভাগ লোককে গরীব করে দিয়ে মুষ্টিমেয় কয়েক জনকে ধনী করে দেওয়ার ফলে ভারতের অর্থনীতি এক অচল অবস্থার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। কল-কারখানা স্থাপনের গতি ক্রমশই কমে আসছে। কারখানায় তৈরি জিনিসপত্রের উৎপাদন ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত বেড়েছিল প্রতিবছর শতকরা প্রায় ৯ হারে। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭০ সালের ভিতর বাড়ে প্রতি বছর শতকরা ৮ হারে। এবং ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ সাল অবধি এই হার কমে দাঁড়ায় প্রায় ৬-এর কাছে। কারখানা শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির গতি এইভাবে ক্রমেই কমে আসছে। কারণ বেশীর ভাগ লোক গরীব হয়ে যাওয়ায় তাদের কেনবার ক্ষমতা বাড়ছে না। ফলে, জিনিসপত্রের চাহিদা কমে যাচ্ছে।

শুধু যে জিনিসপত্র তৈরির গতিবেগ কমে আসছে তা নয়। উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির গতিও কমে আসছে। নূতন নূতন কল-কারখানা তৈরি ক'রে ও কলকব্জা বসিয়ে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ান হয়। এই উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির হার ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালে ছিল গড়ে প্রতিবছর শতকরা ৫'৭। ১৯৬৭ সাল অবধি এই হার প্রতি

বছর কিছু কিছু করে বেড়ে যায় এবং ৬'৪ এ পৌছায়। তারপর থেকে এর গতি কমে আসছে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় প্রতিবছর মাত্র শতকরা ৪'৫ এ।

সব রকম জিনিসপত্রের উৎপাদন-বৃদ্ধি যে কমেছে তা নয়। ধনী শ্রেণীর ব্যবহার্য বিলাসিতার জিনিসপত্রের উৎপাদন খুবই দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের হাতে যতই পয়সা বাড়ছে ততই তারা এই সব বিলাসিতার দ্রব্যসামগ্রী কিনছে। যেমন নাইলন এবং এই ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি সুতা ১৯৬১ সালে তৈরি হয়েছিল গড়ে প্রতি মাসে ২,১৭২ টন। ১৯৭৪ সালে এই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৬,১৪১ টনে। অথচ তুলার সুতার তৈরি কাপড় যা গরীবেরা বেশীর ভাগ ব্যবহার করে থাকে—তার উৎপাদন ছিল ১৯৬১ সালে প্রতি মাসে গড়ে ৩,৯২০ লক্ষ মিটার। এই সংখ্যা কমতে কমতে ১৯৭৫ সালের মার্চ মাসে গিয়ে দাঁড়ায় ৩,৫৬৫ লক্ষ মিটারে।

দেশের বেশীর ভাগ লোক গরীব হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং তাদের হাতে পয়সা না থাকার জন্য কারখানায় তৈরি মালপত্রের চাহিদা তেমন বাড়ছে না; তাই শুধু মুষ্টিমেয় ধনী শ্রেণীর বিলাসিতার চাহিদা মিটিয়ে একটা দেশের শিল্প-বাণিজ্য চালু রাখা সম্ভব নয় বলেই গোটা দেশে শিল্পের উন্নতি ধীরে ধীরে কমে আসছে।

কৃষির উৎপাদনও তেমন বাড়ছে না। নীচের তালিকা থেকে দেখা যাবে ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৭১ সাল অবধি খাদ্যশস্যের উৎপাদন ধীরে ধীরে বেশ কিছুটা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালের পর থেকে উৎপাদন আর বাড়ছে না বরং কমছে। এদিকে মোট লোকসংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে এবং খাদ্যশস্যের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খাদ্যশস্যের উৎপাদন

বৎসর	পরিমাণ
১৯৫১ সালে	৪৮২ লক্ষ টন
১৯৬৪ "	৭০৬ " "
১৯৭১ "	৯৪৯ " "
১৯৭২ "	৯২০ " "
১৯৭৩ "	৮৪৯ " "

১৯৭৫-৭৬ সালে ভাল বৃষ্টি হওয়ায় আশাতিরিক্ত ফসল ফলেছে। আশা করা যাচ্ছে এবার ফসল ১,০০০ লক্ষ টনেরও বেশী হবে। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ প্রত্যেক পাঁচ বছরের ভেতর ২ বছর অনাবৃষ্টি, ২ বছর মাঝারি রকম বৃষ্টি, এক বছর ভাল বৃষ্টি হয়। ফলে প্রতি পাঁচ বছরে এক বছর মাত্র আশাতিরিক্ত ভাল ফসল ফলে; বাকি বছরগুলো হয় মাঝারি রকম ফসল হয়, নতুবা ফসল বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরূপ অবস্থায় দেশের কৃষির উন্নতি যে অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না।

অথচ আজকাল বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাসের এত উন্নতি হয়েছে যে অতি সহজেই জমির ফসল দ্বিগুণ, তিনগুণ বাড়িয়ে ফেলা যায়। কিন্তু এই উন্নত ধরনের চাষ করতে অনেক টাকার প্রয়োজন। গরীব চাষীদের পক্ষে সে টাকা যোগাড় করা সম্ভব নয়। গ্রামের ধনী চাষীরা কিছু কিছু এই উন্নত প্রথায় চাষবাস চালু করেছে; যার ফলে উৎপাদনের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। গ্রামে সুদের হার খুব বেশী থাকায় এবং ব্যবসায়ে টাকা খাটিয়ে অনেক বেশী লাভ পাওয়া যায় বলে গ্রামের ধনীরা তাদের টাকা চাষবাসে না খাটিয়ে, ব্যবসায়ী কারবারে বেশী খাটাচ্ছে। ফলে চাষের উন্নতি যতটা হওয়া সম্ভব ততটা হচ্ছে না। এদিকে লোকসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে; যার ফলে দেশে খাদ্যসংকট ও মুদ্রাস্ফীতি

লেগেই আছে। খাদ্যশস্যের দাম ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে বলে দরিদ্র জনসাধারণের কষ্টও বেড়ে যাচ্ছে। যেহেতু গ্রামের চাষী ও দিন-মজুরদের বেশীর ভাগকেই শস্য কিনে খেতে হয়, তাই তাদেরও খাদ্যশস্যের দাম বাড়ার দরুন অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। আর গ্রামের শুধুমাত্র বড় চাষী, মহাজন ও ব্যবসায়ীরা ক্রমেই আরো ধনী হয়ে উঠছে।

ভারতের বেশীর ভাগ লোকের এই যে অর্থনৈতিক সংকট তার মূল কারণ শুধু খিচুড়ি পন্থায় ও পুঁজিবাদী প্রথায় আমাদের অর্থনীতি চালানোই নয়; বহু প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের সমাজ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; ফলাফল বিচার না করে এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উপর প্রতিযোগিতামূলক পুঁজিবাদী প্রথা চালাবার জন্যেই শোষণপ্রথা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এই শোষণপ্রথার ফলে জনসাধারণ দরিদ্র থেকে অধিকতর দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে। এবং তার জন্যেই বাজার সংকীর্ণ হয়ে গিয়ে আমাদের দেশের খিচুড়িপন্থা তথা পুঁজিবাদী প্রথার সংকট সৃষ্টি করেছে।

বাজারের এই সংকট থেকে আমাদের পুঁজিবাদী পন্থা সাময়িক উদ্ধার পেতে পারত যদি বিদেশের বাজারে চালান দিয়ে দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করা যেত। কিন্তু বিদেশের বাজার সাম্রাজ্য-বাদীরা সব বহু পূর্বেই দখল করে নিয়েছে। তাদের হাত থেকে বিদেশের বাজার কেড়ে নেওয়া সহজ কথা নয়। সুতরাং, দেশের উন্নতির একমাত্র পথ যা আজ ভারতবর্ষের সামনে খোলা আছে তা হচ্ছে সমাজতন্ত্রবাদী উৎপাদন প্রথা চালু করা। কিন্তু তা করতে গেলে সমাজের শোষণব্যবস্থাগুলো সমূলে উৎপাটন করতে হয়। আমাদের সমাজের শোষণপ্রথা যে কত গভীর ও তার শিকড় কতদূর অবধি ছড়িয়ে আছে তা সঠিকভাবে বুঝতে পারলেই আমরা প্রকৃত গণতান্ত্রিক শোষণহীন সমাজ স্থাপন করতে পারব।

আমাদের দেশের শোষণপ্রথা বহু প্রাচীন। সমাজের সমস্ত

আচার-বিচার, ধ্যান-ধারণা, কথাবার্তা ও দৈনন্দিন ব্যবহারের ভেতর শ্রেণীবৈষম্য ও উঁচুনীচু ভেদাভেদ বহু যুগ ধরে গভীর ভাবে জড়িয়ে আছে। আমাদের দেশকে শ্রেণীহীন, গণতান্ত্রিক ও সমাজবাদী দেশে পরিণত করতে হলে সমাজের শ্রেণী ও জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি ভাল করে বোঝা দরকার। এই বইএর প্রথম ভাগে আমরা ভারতবর্ষের প্রাচীন কালের ইতিহাস একটু ঘেঁটে দেখব, যাতে শ্রেণী ও জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারি। আদিম যুগ থেকে আরম্ভ করে ইংরেজদের আমল পর্যন্ত ভারতের স্তর-বিভক্ত সমাজের কাঠামো কি রকম ছিল ও উঁচু স্তরের লোকেরা কি রকম ভাবে নীচু স্তরের লোকেদের শাসনে রাখত সে সম্বন্ধে আলোচনা করব। দ্বিতীয় ভাগে স্বাধীন ভারতের খিচুড়ি উন্নয়ন পন্থার ফলাফল নিয়ে আলোচনা করব। শেষ ভাগে গরীব চাষী, মজুর ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের এই যুগ যুগ ধরে অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাবার পথ এবং দেশকে সত্যি সত্যি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার উপায় নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথম ভাগ

ভারতীয় শোষণপ্রথার ইতিহাস

এক

ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব ও পরিণতি

আর্য-পূর্ব সভ্যতা

ভারতের সমাজ-কাঠামোর ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরেরও বেশী পুরানো। সিন্ধুদেশ, বালুচিস্থান ও পাঞ্জাবের, বিশেষ করে মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পায় যে সব ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে তার বয়স ৩৭০০ থেকে ৪৪০০ বৎসর বলে বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করেছেন। এর থেকেও প্রাচীন অনেক ধ্বংসস্তূপ পাঞ্জাব, রাজস্থান ও সিন্ধুদেশে পাওয়া গেছে। সিন্ধুদেশের আমরী ও কৌটদিজি নামক জায়গাগুলিতে যে ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে তার বয়স হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর থেকেও বেশী বলে নির্ধারিত হয়েছে। এইসব প্রাচীন শহরগুলি তৈরি হবার বহু পূর্বের ভারতবর্ষের লোকদের বসবাসের কিছু কিছু নিদর্শন এখানে ওখানে পাওয়া গিয়েছে। পাথরের অস্ত্রশস্ত্র, মাটির বাসন ইত্যাদি কিছু কিছু ভারতবর্ষের প্রায় সব অংশেই পাওয়া গেছে। শোন নদীর উপত্যকায় পাথরের অস্ত্রশস্ত্র এবং মাদ্রাজ, মহীশূর, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও বঙ্গদেশে যে সব পাথরের কুঠার ও যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে তা থেকে প্রমাণ হয় যে ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই প্রাচীন মানুষের বসবাস ছিল। সে যুগের মানুষেরা শিকার করে ও ফলমূল আহরণ করে জীবনযাপন করত। তারা পশুপালন করে শিকারের অনিশ্চয়তা তখনও দূর করতে শেখেনি। কিন্তু হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসস্তূপে পশুপালনের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। হরপ্পায় ষাঁড়ের ছাপ

দেওয়া শিলমোহর প্রসিদ্ধ। হরপ্পার লোকেরা পোড়া ইঁটের শহর তৈরি করেছিল। তাদের বাড়ীতে ৩।৪ খানা কামরা থাকত। কোনো কোনো বাড়ী দোতালাও ছিল এমন নিদর্শন আছে। তাদের জল সরবরাহের জন্য মাটির নীচে নালার ব্যবস্থা ছিল। শস্য রাখবার জন্যে তাদের যৌথ ধর্মগোলা, সভাগৃহ ও স্নানাগার বিশেষ প্রসিদ্ধ। সেখানে একটা ইঁটের উপর প্রথমে বিড়ালের ও তার উপর কুকুরের পায়ের ছাপ থেকে বোঝা যায় তারা বিড়াল ও কুকুর পোষ মানাতে শিখেছিল এবং তাদের যুগের বিড়াল-কুকুরের সম্বন্ধ বর্তমান যুগের বিড়াল-কুকুরের সম্বন্ধ থেকে বিশেষ ভিন্ন ছিল না।

হরপ্পার যুগে যৌথ শস্যগোলার পাশেই ছোট ছোট সারি সারি ঘর দেখা যায়। এই ঘরগুলোতে শ্রমিকরা বা ক্রীতদাসরা থাকত। এ থেকে বোঝা যায় যে সেই সময় থেকেই ভারতবর্ষের দাস শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল।

আর্য সভ্যতা

আর্য জাতি পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থান করত। তারা যাযাবর ছিল ও পশুপালনই তাদের প্রধান জীবিকা ছিল। অনেকের মতে আর্যদের আক্রমণের ফলেই হরপ্পা সভ্যতার পতন হয়। আর্যরা ইরাণ হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং পাঞ্জাবের স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের পরাজিত করে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। ক্রমে ক্রমে তারা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং বহু বছর ধরে তাদের স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে হয়। পুরাণে এই যুদ্ধই দেবাসুরের যুদ্ধ নামে খ্যাতিলাভ করে। অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রথা আর্যদের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যেই প্রচলন হয়েছিল।

যদিও মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ও অন্যান্য শহরের অধিবাসীরা আর্যদের তুলনায় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে অনেক উন্নত ছিল, তথাপি

যুদ্ধ-কৌশলে তারা ততটা দক্ষ ছিল না। তারা শহর সংগঠনে পটু ছিল এবং তাদের সমাজে খাদ্য ও ব্যবহার্য জিনিস-পত্র উৎপাদন ও সরবরাহের সুচারু ব্যবস্থা থাকায় যুদ্ধের প্রয়োজনও তাদের কম ছিল। বিশেষ করে তারা ঘোড়ার ব্যবহার জানত না। আর্যরাই প্রথম এদেশে ঘোড়া নিয়ে আসে। ঘোড়ার ব্যবহারের ফলে হঠাৎ অতর্কিত আক্রমণ অনেক সহজ হয়ে যায়। এরই জন্যে আর্যরা ধীরে ধীরে উত্তর ভারতে তাদের প্রভুত্ব স্থাপন করে ফেলে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের দাসে পরিণত করতে সক্ষম হয়।

বর্ণ বা জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব

আর্যদের রং ছিল ফরসা এবং স্থানীয় অধিবাসীদের রং ছিল কালো। আর্যরা বিজয়ী জাতি, তারা বিজয়ী জাতির সহজাত ধর্ম অনুযায়ী নিজেদের শ্রেষ্ঠতর বলে চালু করে ফেলল। পরাজিত আদিম অধিবাসীরা দাস ও শোষিত শ্রেণীতে পরিণত হল। রং বা বর্ণ দিয়ে এই দুই জাতির ভেতর পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছিল বলে জাতিভেদ প্রথার নাম হয় বর্ণাশ্রম ধর্ম। ক্রমে ক্রমে আর্যদের ভেতর কাজকর্মেও বিভাগ এসে যেতে লাগল। এক দল শাসন ও যুদ্ধে বেশ কৃতিত্ব অর্জন করল; এরা হল ক্ষত্রিয়। আর এক দল নানারকম গবেষণা, দর্শন, ধর্ম ও আচার-বিচারে পারদর্শী হল; তারা হল ব্রাহ্মণ। পরে ব্যবসায়ী বিশেষজ্ঞরা ধীরে ধীরে উক্ত জাতিগুলি থেকে বিভক্ত হয়ে বৈশ্য জাতির সৃষ্টি করল। এইরূপে আর্য সমাজ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল এবং অনার্যরা দাস বা শূদ্র শ্রেণীতে পরিণত হল। তখন চতুর্বর্ণের উদ্ভব হল।

জাতিভেদ প্রথার ফলে উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি

প্রত্যেক জাতির কাজকর্ম আলাদা ছিল বলে বংশ পরম্পরায় তারা এই কাজে ছোটবেলা থেকে শিক্ষালাভ করে কর্মনিপুণ হতে পারত। সুতরাং ধীরে ধীরে এই জাতিভেদ বংশগত হয়ে গেল।

প্রথম দিকে একজাতি থেকে অন্য জাতিতে উদ্গমন মোটেই কষ্টকর ছিল না—কর্মদক্ষতা থাকলেই তা পারা যেত। কিন্তু জাতি বংশগত হবার পর এরকম পরিবর্তন আর সম্ভব হল না।

জাতিভেদ বা বর্ণাশ্রম সৃষ্টি হবার একটা মস্ত কারণ এই যে, এই প্রথায় সমাজের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল। একেক দল লোক একটা কাজ সারাজীবন ধরে বংশ পরম্পরায় করার জন্যে তাদের কাজে খুব নিপুণতা এসে যায়। ফলে সমাজের মোট উৎপাদন ক্ষমতা বেশ বৃদ্ধি পায়।

অনার্য সমাজ-গোষ্ঠীর লোকদের গণতান্ত্রিক সংগঠন ছিল। তাদের আদিম সমাজ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রথায় চলত। ফলে, এদের ভেতরকার সংগঠন খুব দৃঢ় ছিল এবং প্রত্যেকের সমাজ-গোষ্ঠীগত চেতনা খুব প্রখর ছিল। সেই কারণে আর্যদের এইসব অনার্য সমাজ-গোষ্ঠীগুলোকে জয় করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কিন্তু আর্যদের উৎপাদন ক্ষমতা বেশী থাকায় দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সামর্থ্য বেশী ছিল। ফলে, শেষ পর্যন্ত তাদেরই জয় হয়। আদিম অনার্যরা পরাজিত হয়ে দাস শ্রেণীতে পরিণত হয়।

মনুর সমাজ-ব্যবস্থা

আর্যদের শাসক, দার্শনিক ও আইনকানুনবিদরা সহজেই বুঝে নিয়েছিল যে জাতিভেদ প্রথায় তাদের নিজেদের বিশেষ সুবিধা হচ্ছে এবং অনার্যদের উপর প্রভুত্ব বিস্তারে এই প্রথা তাদের খুবই সাহায্য করছে। সুতরাং তারা প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে যাতে জাতিভেদ প্রথা ক্রমশই কঠোর হয়। আর্যদের আইন-কানুন প্রথম লিখে যান মনু নামে খ্যাত একজন পণ্ডিত। মনু যে শাস্ত্রবিধি তৈরি করে দেন তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই জাতিভেদপ্রথাকে পাকাপোক্ত করে আর্যদের প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করা। এই জাতিভেদ প্রথার ভিত্তিতে যে সমাজ-সংস্থা আর্যরা তৈরি করেছিল তাকে

চিরস্থায়ী করাই যে মনুর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তা পরিষ্কার বোঝা যায় তাঁর লোকসংখ্যা রোধের বিধি থেকে এবং কলকব্জা আবিষ্কারের বিরুদ্ধে তাঁরই নির্দেশ থেকে।

মনু বুঝতে পেরেছিলেন যে জাতিভেদ প্রথা চালু রাখতে হলে প্রত্যেক জাতির লোকসংখ্যার ভেতর একটা পারস্পরিক সামঞ্জস্য রাখা দরকার। যদি কোন জাতির লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়ে এই পারস্পবিক সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এই জাতি যে দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করে, চাহিদার তুলনায় তার সরবরাহ খুব বেশী হয়ে যায়। ফলে তাদের লোকসান হতে থাকে এবং তারা অন্য জাতির পেশার দিকে আকৃষ্ট হয়। এরূপ অবস্থায় জাতিভেদ প্রথা যে টেকান মুস্কিল হয়। সুতরাং মনু নির্দেশ দিলেন যে প্রত্যেক জাতির লোকসংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তিনি একপ্রকার জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধি চালু করার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, প্রথম পুত্র 'ধর্মজ' এবং পরের পুত্র সন্তানেরা 'কামজ'। 'কামজ' সন্তানের জন্ম নিরোধের জন্য তিনি নির্দেশ দেন। জন্ম নিরোধের উপায় হিসাবে তিনিই প্রথম 'নিরাপদ সময়ের' উপদেশ দান করেন।

জাতিভেদ প্রথা ও উচ্চ শ্রেণীর জাতিদের প্রভুত্ব নষ্ট হয়ে যাবার দ্বিতীয় বিপদ আসতে পারত উন্নততর যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের থেকে। কোনো জাতি যদি কোনো উন্নত ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলে তাহলে তাদের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যাবে। তার ফলে চাহিদার চাইতে উৎপাদন বেশী হ'তে থাকবে এবং এই জাতির লোকেদের লোকসান হতে থাকবে। তখন তারা অন্য জাতির পেশার দিকে আকৃষ্ট হবে। সুতরাং মনু নির্দেশ দিলেন যে কোনোরকম উন্নততর যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করা চলবে না। যদি কেউ কোনো নূতন কিছু আবিষ্কার করে তবে তাকে শাস্তি পেতে হবে ও ঐ আবিষ্কার নষ্ট করে দেওয়া হবে।

জাতিভেদ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে উৎপাদন প্রথা চালু রাখার

জন্য চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা প্রয়োজন। চাহিদা ও সরবরাহের ভেতর সামঞ্জস্য রাখতে গেলে প্রত্যেক জাতির উৎপাদকদের ভেতর পারস্পরিক সংখ্যার অনুপাত ঠিক রাখা দরকার এবং কোনো জাতি যাতে উৎপাদন বেশী না করে ফেলে তার জন্য সব রকম যন্ত্রের আবিষ্কার বন্ধ রাখা দরকার।

যন্ত্রের আবিষ্কার বন্ধ করে দেওয়াতে ভারতবর্ষের সমাজ প্রগতিহীন, রক্ষণশীল ও সংস্কারাবদ্ধ হয়ে পড়ে। উচ্চ শ্রেণীর লোকদের প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য এক গতিহীন স্থিতিশীল সমাজ তৈরি হয়। উচ্চ শ্রেণীর প্রভুত্বকে চিরস্থায়ী করবার জন্য শুধু যে যান্ত্রিক উন্নতির অবসান ঘটান হল তা নয়, উপরন্তু লোকের মন থেকে কোনোরকম পরিবর্তনের চিন্তা যাতে চিবকালের মত বিদায় নেয় তার ব্যবস্থাও করা হল—'ধর্ম', 'কর্মফল' ও 'পুনর্জন্মে'র মতবাদ প্রচার করে। উচ্চ ও নিম্নজাতির লোকদেব সঙ্গে ব্যবহারের সময় নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন অনুসারে ব্যবহার করা প্রত্যেক মানুষের 'ধর্ম' বলে অভিহিত হ'ল। এমন কি নিজের জাতির লোকদের সঙ্গে ব্যবহারের সময়ও নিয়ম-মাফিক ব্যবহার করা তার 'ধর্ম' বলে নির্দেশ দেওয়া হল। ধর্মের নামে এইসব নিয়ম-কানুন প্রচলনের ফলে সমাজে শান্তিরক্ষা করা সহজ হ'ল এবং সমাজ-ব্যবস্থার আয়ুও দীর্ঘস্থায়ী হ'ল। তখন যদি কেউ এই সমাজ-ব্যবস্থার ফলে কষ্ট পেত এবং তার উপর অন্যায় ও অবিচার করা হয়েছে মনে করত, তাহলেও সে তা নিজের পূর্বজন্মের কর্মফল বলে এবং পরজন্মে বিচার পাবে এই আশায় মুখ বুজে সহ্য করত। কাজেই এই সব মতবাদ উচ্চ শ্রেণীর প্রভুত্ব বজায় রাখতে ও জাতিভেদ প্রথাকে স্থায়ী করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

মনু ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এইসব নিয়ম-কানুন ও দর্শন-শাস্ত্র তৈরি করার উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে যে সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তাকে চিরস্থায়ী করা এবং তার কোনো প্রকার অদল-

বদল যাতে না হয় সে ব্যবস্থা পাকা করা। এই সমাজ-ব্যবস্থায় জয়ী আর্যরা নিজেদের শাসক শ্রেণীতে রূপান্তরিত করেছিল এবং স্থানীয় অনার্য বাসিন্দাদের দাসে পরিণত করেছিল। কাজেই জাতিভেদযুক্ত সমাজ-ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত ও চিরস্থায়ী রাখার মানেই হল উচ্চ শ্রেণীর আর্যদের রাজত্ব কায়েম রাখা।

মনু ও অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের শিক্ষা সত্ত্বেও ভারতের শ্রেণীগুলির ভেতর সারাক্ষণই তুমুল দ্বন্দ্ব চলত ক্ষমতার জন্য। প্রথম প্রথম ক্ষত্রিয়দের নেতৃত্বে অনার্যদের সঙ্গে যুদ্ধে আর্যরা জয়লাভ করেছিল বলে সমাজে ক্ষত্রিয়রাই বেশী ক্ষমতাশালী হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণরা তাদের ক্ষমতা বিস্তার করতে সক্ষম হয়। প্রথম দিকে ব্রাহ্মণরা অন্যান্য শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখার জন্য কৌশল হিসাবে ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করেছিল।[১] পরে তারা ক্ষত্রিয়দের হাত থেকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিতে সফল হয় এবং এই রকম নিয়ম প্রবর্তন করে:

"একজন ব্রাহ্মণের অধীনে অন্যান্য তিন বর্ণের লোকেরা থাকবে। ব্রাহ্মণের কাজ হবে ঐ সব লোকের কার কি কাজ ও কর্তব্য তা নির্ধারিত করে দেওয়া এবং রাজার কাজ হবে এই নির্দেশগুলি যাতে পালিত হয় তার ব্যবস্থা করা।"[২]

পরাশর-সংহিতায়ও তেমনি নির্দেশ আছে,—

"ব্রাহ্মণ যা বলে তাই ধর্ম। যে ব্রাহ্মণের বাক্য অমান্য করে তাকে ব্রাহ্মণ হত্যার দায়ে দোষী করা হবে।"

১। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের সহায়তা ছাড়া প্রাচুর্য ভোগ করতে সক্ষম হয় না; ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয় ছাড়া প্রাচুর্য ভোগ করতে পারে না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত থাকলে এই জগতে ও পরকালেও প্রাচুর্য ভোগ করতে পারে।"

[সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সম্পাদিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থে কে. এ. নীলকান্ত শাস্ত্রীর লেখা "মনু ও কৌটিল্য" নামক প্রবন্ধের ১১৩ পৃষ্ঠা থেকে সহজ অনুবাদ।]

২। গুয়ালিথেরাস এইচ. মিজ এর রচিত "ধর্ম ও সমাজ" নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত বাসুটর রচিত সূত্রের সহজ অনুবাদ।

বৌদ্ধযুগের অভ্যুত্থান

ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রাধান্য অবশ্য একদিনে স্থাপিত হয়নি। যুগযুগ ধরে প্রচার চালিয়ে তাদের নিজেদের প্রাধান্য তারা জাহির করবার চেষ্টা করেছে। নিজেদের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকায় এই প্রচারে তাদের সুবিধাই হয়েছে। তথাপি অন্যান্য শ্রেণীগুলো সব সময়েই যে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছে তা নয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন কালের ইতিহাস দুইপ্রকার সংঘাতের ইতিহাস,—এক হচ্ছে, গোষ্ঠীগত লড়াই (tribal warfare)। রাম-রাবণের যুদ্ধ (ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে) কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ (নিজ গোষ্ঠীব মধ্যে) এই শ্রেণীর লড়াই ছিল। এই লড়াইএর সাঙ্গে সঙ্গে ভেতরে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের যুদ্ধ সর্বক্ষণই চলতে থাকত। গোষ্ঠীগত লড়াই চলত কে রাজা হবে তাই নিয়ে। প্রাচীন কালের রাজাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের সমর্থক শ্রেণী বা ট্রাইবের স্বার্থেই তাদের কাজ করতে হত। অর্থাৎ রাজাদের পিছনে যে সমর্থকরা থাকত তাদের স্বার্থেই রাজাকে চলতে হত।

বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হবার পূর্ব পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের আধিপত্য একচেটিয়া ছিল। বৌদ্ধযুগে ব্রাহ্মণ শ্রেণী আবার ক্ষমতাচ্যুত হয়। এবার ক্ষত্রিয় ও বণিক শ্রেণীর 'যুক্তফ্রন্ট' তৈরি হয় এবং তারা দেশের শাসন ক্ষমতা অধিকার করে।

খ্রীষ্টের জন্মের ১০০০ বছর আগে স্থলপথে ও সমুদ্রপথে রোম নগরীর সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্য সূত্র স্থাপিত হয়। এই যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গেও সমুদ্রপথে আমদানি ও রপ্তানি সুরু হয়। দেশের ভিতর ও গঙ্গানদীর পার দিয়ে এবং বিন্ধ্য পর্বত পার হয়ে দাক্ষিণাত্যে বাণিজ্য-পথ স্থাপিত হয়। ফলে, বৈশ্যশ্রেণী প্রচুর ধনশালী হয়ে উঠে। এমন কি শহরের কারিগররা একত্র হয়ে ব্যবসা-সংঘ স্থাপন ক'রে বেশ প্রতিপত্তিশীল হয়। রাজা ও শাসন-কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে এদের মৈত্রী সহজেই স্থাপিত হয় এবং এরা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ফ্রন্ট গঠন করে।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অভ্যুত্থান ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নৈতিক প্রেরণা যোগায়।

"অসাধারণ প্রতিভাবান্ ক্ষত্রিয়রা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সাহায্যে একটা নূতন আন্দোলন আরম্ভ করতে সুযোগ পান, যার ফলে তাদের অনুগামীরা ব্রাহ্মণদের উপর ক্ষত্রিয়দের প্রাধান্য স্থাপন করতে সক্ষম হন।"[১]

শূদ্রদের দাসত্ব

যদিও প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের ভেতর শাসন ক্ষমতা নিয়ে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব চলত তথাপি শূদ্রদের উন্নতির বেলা এরা সবাই একমত ছিলেন। প্রাচীন যুগের পণ্ডিত ও আইন-কানুন বিশারদরা শূদ্রদের দাসত্বের ও শোষণের বিরুদ্ধে কদাচিৎ মত প্রকাশ করেছেন। মহাভারতের লেখকের মতে শূদ্রদের মালিকানার কোনো অধিকার নাই; কারণ তাদের সম্পত্তি ইচ্ছা মত তাদের কর্তারা নিয়ে নিতে পারেন।[২]

মনুর মতে ভূমিহীন শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম হয়েছে শুধুমাত্র উচ্চ শ্রেণীর জন্যে কাজ করতে।[৩] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মতে শূদ্রদের জোর করে বেগার খাটান সম্পূর্ণ আইন সঙ্গত। ভাগচাষীদের (চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে যাদের অর্ধ-সীতিকা বলা হয়েছে) এবং উঠ-বন্দী চাষীদের (যাদের বৃহস্পতি স্মৃতিতে শির-বাহক বলা হয়েছে) ফসলের অর্ধেক থেকে ১২ আনা অংশ তাদের উচ্চবর্ণের মালিকদের দেওয়ার বিধি ছিল।

১। জি. এস. ঘুরিয়া রচিত "ভারতের বর্ণ ও জাতি" পুস্তকের ৬৪ পৃষ্ঠার সহজ অনুবাদ।

২। মহাভারত; শান্তিপর্ব। ৩। মনুস্মৃতি; ৮ম অধ্যায়।

বৌদ্ধ প্রতিপত্তির অবসান

উত্তর ভারতে বৈশ্য শ্রেণীরাই ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে প্রধান অংশ নিয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ শ্রেণীই ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্পূর্ণ অংশ নিয়েছিল। কোনো কোনো জায়গায় ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্রাহ্মণদের উৎসাহ এত বেশী ছিল যে তাদেরই লোকে ব্যবসায়ী শ্রেণী বলে মনে করত।[১] ফলে দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণরা তাদের অর্থের জোরে বৌদ্ধ ও জৈনদের হাত থেকে ক্ষমতা রক্ষা করতে পেরেছিল।

বৌদ্ধ ও জৈনদের প্রাধান্য বেশীদিন টিকল না। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার মঙ্গোলদেব উৎপাতের ফলে স্থলপথের রপ্তানি প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। তাই উত্তর ভারতের ব্যবসায়ী শ্রেণী প্রায় বিলুপ্ত হয়ে পড়ল। এদের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ রাষ্ট্র ও সংঘগুলিরও পতন হল। কেন না, এদের আয়ের উপরই বৌদ্ধ রাষ্ট্র ও সংঘ স্থাপিত ছিল।

দাক্ষিণাত্যের রপ্তানি ব্যবসায় সমুদ্রপথে হওয়ার ফলে ঐরূপ বিপর্যয়ে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত হল না। তাই দাক্ষিণাত্যের ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ শ্রেণী আগের মতোই ধনী ও ক্ষমতাসম্পন্ন থেকে গেল। উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণত্বের পুনঃ প্রবর্তনের এটাও একটা কারণ হতে পারে। দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণেরা উত্তর ভারতে বৌদ্ধ ও জৈনদের কোনঠাসা করে ফেলল এবং বৌদ্ধ ধর্ম ভারত থেকে প্রায় বিতাড়িত হল।

সামন্ত প্রথা

ব্যবসা-বাণিজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্য শ্রেণী ও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতিপত্তি কমে গেল। জমিই তখন প্রধান সম্পদে পরিণত হল এবং জমির মালিকরা আবার ক্ষমতায় আসীন হল। আর্যদের

১। রমিলা থাপর রচিত "ভারতের ইতিহাস" ; প্রথম খণ্ড, ১১১ পৃষ্ঠা

আমলেই চাষীদের কাছ থেকে নানা উপায়ে জোর করে ফসল আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাজারা তাদের অধীনের সামন্তদের দিয়ে খাজনা আদায় করাত। সামন্তরা এই আদায়ের একটা মোটা অংশ রেখে দিত। এই আদায়ের সুবিধার জন্য সামন্তরা সৈন্য রাখত। পরের যুগে এদেরই বলা হত "পাইক"। রাজাদের পক্ষে সামন্তদের শাসনে রাখা সব সময় সম্ভব হয়ে উঠত না এবং এদের বিদ্রোহের ফলে রাজ্যে অরাজকতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। রাজ্য দুর্বল হয়ে যাওয়ায় জল-সরবরাহ-প্রণালী ও রাস্তাঘাট নষ্ট হয়ে যেত। ফলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা কমে গিয়ে রাজ্যের কর আদায়ও কমে যেত। তাতে শহরের পতন হত এবং শহরের উৎপাদন কেন্দ্রগুলি নষ্ট হয়ে যেত। গ্রামগুলো তখন সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হয়ে পড়ত এবং অত্যন্ত অল্প উৎপাদনের ভিত্তিতে জীবন-যাপন করত। গ্রামের লোকে যা ফসল উৎপাদন করত তা নিজেরাই খেয়ে ফেলত। তাই তাদের আবশ্যকীয় জিনিস-পত্র, কাপড়-চোপড়, হাল-লাঙল ইত্যাদি নিজেদেরই তৈরি করে নিতে হত। ফলে, বাইরের সঙ্গে গ্রামের ব্যবসা-বাণিজ্য বা কোনো প্রকার যোগাযোগ রাখার প্রয়োজন হত না।

ভারতের আদিবাসীরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের সমাজ-ব্যবস্থা ও সামাজিক অনুশাসন চালাত। জমি-জমাতে তাদের ব্যক্তিগত অধিকার ছিল না, সমাজের সকলের যুক্ত অধিকার ছিল। আর্যরা আদিবাসীদের পরাজিত করে তাদের সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে দেয় ও জমাজমিতে ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপন করে। সব জায়গারই ভাল উর্বর জমিগুলো তারা নিজেরা দখল করে নেয় ও আদিবাসীদের অনুর্বর পাহাড় ও জংলা জমিতে চলে যেতে বাধ্য করে।

বৌদ্ধ যুগের অবসানের পর ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের অবনতি হল। জমিই তখন উৎপাদনের প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়াল এবং জমিতে ব্যক্তিগত অধিকার আরও জোরাল ভাবে চালু হ'ল।

যেসব জায়গায় আর্যদের প্রতিপত্তি কম ছিল এবং আদিবাসীরা তাদের সমাজ-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছিল, সে সব জায়গার জমিতে সমষ্টিগত অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকল।

বৌদ্ধ যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জমির উপর চাপ বেশী পড়ল। জমির উপর সামন্ত রাজাদের শোষণও বেড়ে গেল। জমির উদ্বৃত্ত ফসল এরা নিয়ে নিতে লাগল এবং তা নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদে খরচ করতে লাগল।

"জুয়াখেলা, মদ, নাচ ও বেশ্যা ছিল আমোদ-প্রমোদের প্রধান উপকরণ। রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি জায়গাগুলো, বিশেষ করে ভোরবেলা, অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গা বলে মনে করা হত, কারণ এই সময় রাজার কর্মচারী ও অনুচরবৃন্দ বেশ্যার বাড়ী থেকে মত্ত হয়ে ফিরত।"[১]

সামন্তদের অত্যাচারের ফলে সমাজের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক কমে গেল এবং রাজ্যগুলো দুর্বল হয়ে পড়ল। মুসলমান রাজাদের পক্ষে এরূপ দুর্বল ও পরস্পর বিবাদমান রাজ্যগুলো জয় করে নেওয়া মোটেই কঠিন হল না।

মুসলমান রাজাদের আমল

রাজ্য মুসলমান রাজাদের দখলে আসবার পর আবার ইউরোপ ও আরব দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু হল। মোগল, পাঠান রাজারা বড় বড় শহরগুলোতে তাদের আড্ডা বসাল। বিদেশী বাণিজ্য আবার চালু হল। তাতে নিপুণ গৃহশিল্পীদের কদর বেড়ে গেল। তারা শহরে তাদের কারখানা চালু করে দিল। মুসলমান রাজাদের উৎসাহে তারা অনেকেই গোষ্ঠীশুদ্ধ মুসলমান

১। "মৃচ্ছকটিক" গ্রন্থে উল্লিখিত।

ধর্মে দীক্ষা নিল। এইরূপ অনেক মুসলমান কারিগরদের অনেক চারু-শিল্প আমরা আজও দেখতে পাই; যেমন সূচীশিল্প, কার্পেট বোনা, সূক্ষ্ম রেশম ও সূতার কাপড় বোনা, জুতা ও চামড়ার কাজ ইত্যাদি।

শুধু যে বাইরের জগতের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য আবার শুরু হল তাই নয়, ভারতের ভেতরেও অনেক ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ শহর গড়ে উঠল। প্রত্যেক মোগল-পাঠান ও হিন্দু রাজাদের রাজধানী এক একটা শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হল। এইরূপে দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষ শিল্পপ্রধান সমাজ-কাঠামোর দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। প্রথমবার বৌদ্ধ জাগরণ ও গ্রীক ও আরব দেশের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হয়েছিল। তা ধ্বংস হয় ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়াতে। দ্বিতীয়বার মোগল-পাঠানদের আমলে আবার শিল্পবিপ্লব আরম্ভ হয়, কিন্তু এবারও তা ধ্বংস হল ইংরেজদের আক্রমণের ফলে।

অনেকের মতে ইংরেজরা যদি ভারতবর্ষে না আসত তা হলে ভারতবর্ষেও শিল্প-প্রধান সমাজব্যবস্থা বা পুঁজিবাদী ইউরোপে যে রকম হয়েছিল তা স্বাভাবিক গতিতেই স্থাপিত হত। ইংরেজের রাজত্বের ফলে ভারতবর্ষের স্বাভাবিক শিল্পোন্নতি ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষে জাতিভেদমূলক সমাজ-ব্যবস্থা থাকায় এই ধরনের স্বাভাবিক পরিবর্তন হওয়ার পক্ষে অবশ্য প্রচুর বাধা ছিল। ভারতবর্ষে ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের প্রতিপত্তি হয়েছিল বৌদ্ধ যুগে এবং মোঘল ও পাঠান রাজাদের আমলে। কিন্তু এই ব্যবসায়ী পুঁজিতন্ত্র শিল্প-প্রধান পুঁজিতন্ত্রে রূপান্তরিত হ'ত কিনা তা সঠিক বলা যায় না।

ব্যবসায়ী পুঁজিতন্ত্র সব সময়েই যে শিল্পপ্রধান পুঁজিতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। যেমন, রোম সাম্রাজ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রচুর উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাণিজ্যের ফলে যে পুঁজি সঞ্চিত হয়েছিল তা শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যবহৃত না হয়ে ক্রীতদাস প্রথার সৃষ্টি করল এবং ক্রীতদাসদের উপর উৎপাদনের

ভার চাপিয়ে দিয়ে মালিকরা নানাপ্রকার বিলাসিতায় তাদের সঞ্চয় ব্যয় করল। তেমনি স্পেনে প্রচুর ব্যবসায়ী মূলধন জমায়েত হয়েছিল। কিন্তু শিল্পপ্রধান পুঁজিতন্ত্র স্থাপনের কাজে সে অর্থ ব্যবহার না করে স্পেনের মালিক শ্রেণী তা সামন্তবাদী শোষণ ও বিলাসিতায় ব্যয় করে। ব্যবসায়ী পুঁজিতন্ত্র শিল্পপ্রধান পুঁজিতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে কিনা তা নির্ভর করে সেই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর। সাধারণতঃ কোন দেশের ব্যবসায়ী শ্রেণীর যদি সমাজে একচেটিয়া অধিকার থাকে, ও শাসন-ক্ষমতা সম্পূর্ণ তাদের হাতে থাকে এবং সে দেশের শ্রমিক, কারিগর ও চাষারা যদি সংগঠনের অভাবে দুর্বল থাকে আর তাদের যদি সহজেই মজুরী কমিয়ে দিয়ে ও অন্যান্যভাবে নির্বিঘ্নে শোষণ করা যায়, তাহলে সেই দেশের ব্যবসায়ী মালিকদের কলকারখানা বসিয়ে শ্রমিকদের দিয়ে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার কোনো তাগিদ থাকে না। এরকম অবস্থায় সমাজ ক্রীতদাস প্রথার সামিল সামন্তবাদে রূপান্তরিত হয়।

ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার ফলে উচ্চশ্রেণীর লোকেদের সমাজের সকলের উপর একচ্ছত্র অধিকার ছিল। সমাজে অনুন্নত জাতির শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীকে শোষণ করার প্রায় অবাধ অধিকার ছিল। ফলে কলকব্জার সাহায্যে শোষণ বাড়াবার কোনো প্রয়োজন হয় নি; যেমন ইচ্ছা চাপ দিয়ে মজুরী কমিয়ে, সুদের হার বাড়িয়ে, জমির খাজনা বাড়িয়ে শ্রমিক ও চাষীদের শোষণ করা যেত। এমন সব সমাজেই অনুন্নত শ্রেণীকে সীমাহীন ভাবে শোষণ করা যায় বলে মালিক শ্রেণীর কলকারখানা তৈরী ক'রে শিল্পপ্রধান সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপনের কোনো উৎসাহ থাকে না। কারণ কলকারখানা থেকে যা লাভ করা যায় চাষী ও শ্রমিকদের কাছ থেকে সুদ, খাজনা ও কেনা-বেচার মারফৎ তার চাইতে অনেক বেশী লাভ হয়। তাই, শিল্পপ্রধান উৎপাদন পন্থা থেকে ব্যবসা, সুদখোরী মহাজনী ও জমির মালিকানার দিকে বেশী উৎসাহ থাকে তাদের।

ইংরেজ আমল

ইংরেজরা আমাদের দেশ দখল করার পর জাতিভেদ প্রথার কোনো পরিবর্তন ত করলই না, বরং উঁচু স্তরের লোকদের তাদের পক্ষে টানবার জন্যে জাতিভেদ প্রথাকে আরও মজবুত করল। ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশের উঁচু শ্রেণীগুলিকে গরীব ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদের শোষণ করবার আরও সুবিধা করে দিল।

ভারতের উঁচু শ্রেণীর লোকেরা ইংরেজি শিখে ইংরেজ সরকারের চাকরি নিয়ে নিল। ইংরেজ কম্পানিগুলির দালাল হয়ে ব্যবসায়ী শ্রেণী ইংরেজ কর্তাদের জন্য গ্রাম থেকে সস্তায় কাঁচা মাল কিনতে লাগল ও ইংরেজের কারখানায় তৈরি মালপত্র গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে ছড়িয়ে দিতে লাগল। ইংরেজরা তাদের আশ্রিত উঁচু শ্রেণীর দালালদের জমির মালিক করে দিল। এই নূতন জমিদারশ্রেণী চাষীদের চরম ভাবে শোষণ করতে লাগল। জমির উপর কর ধার্য হল, সুদের বাবদ জমি তাদের হাতছাড়া হতে লাগল। চাষীরা ক্ষেতের ফসল কম দামে বিক্রী করতে বাধ্য হল। অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র, কাপড়-চোপড় যা আগে গ্রামেই তৈরি হত এখন তা বিদেশ থেকে আমদানি করে ডবল দামে গ্রামের লোকদের কিনতে বাধ্য করা হল। ফলে উঁচু শ্রেণীর লোকেদের—চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ীদের অবস্থা যেমন দিন দিন ভাল হতে লাগল, নিম্নশ্রেণীর লোকেদের অবস্থা তেমনি খারাপ হতে শুরু হল।

প্রাচীনকালে যে জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষে চালু ছিল তাতে করে উঁচু শ্রেণীর লোকেরা নীচু শ্রেণীর লোকদের দাবিয়ে রেখে শোষণ করলেও সে শাসন ও শোষণ কখনও মাত্রা ছাড়িয়ে যেত না। নানা রকম শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ দেওয়া ছিল যাতে উঁচু শ্রেণীর শোষণ ও শাসন নিম্নশ্রেণীর পক্ষে অসহনীয় হয়ে না পড়ে এবং সমাজ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে না যায়। ইংরেজদের আমলে এই বিধি-নিষেধ আর থাকল না। দেশের শান্তি রক্ষার ভার ইংরেজরা নিয়ে নিল। এই

অবস্থায় উঁচু শ্রেণীর লোকদের খুবই সুবিধা হল। তখন তারা শুধু তাদের মুনাফা ও টাকা আয়ের দিকেই মন দিল। ফলে নীচু শ্রেণীর উপর শোষণের আর কোনো সীমা থাকল না। ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার উপর ভিত্তি করে কয়েক হাজার বছর ধরে যে সমাজ-ব্যবস্থা চলে আসছিল, ইংরেজদের শাসনের ফলে সে সমাজ-ব্যবস্থার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল। হাজার হাজাব বছর ধরে ভারতবর্ষে উঁচু নীচু সব জাতির লোকেরাই তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ শাস্ত্রীয় মতেই নিজে থেকেই পালন করত। ইংরেজরা আসার পর এই শাস্ত্রীয় বিধান ভেঙ্গে পড়ল,—আইন-কানুন করে পুলিশ দিয়ে জোর জুলুম করিয়ে ও জেলের সাহায্যে নীচু বর্ণের লোকদের শায়েস্তা করে রাখা হল যাতে ইংরেজদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে উঁচু জাতির লোকেরাও তাদের সীমাহীন শোষণ চালিয়ে যেতে পারে।

স্বাধীন যুগ

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর এই শোষণ ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র হ্রাস হল না বরং নীচু শ্রেণীর ওপর শোষণের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর দেশের লোকেদের হাতে নানা রকম সুযোগ সুবিধা এসে পড়ল। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নানা পরিকল্পনা ক'রে প্রচুর টাকা ব্যয় করা হল। বলা বাহুল্য, এই সব খরচার সুযোগ-সুবিধা শিক্ষিত ও ধনী শ্রেণী এবং উঁচু জাতির লোকেরাই ভোগ করল। নীচু বর্গের দরিদ্র জনসাধারণ সে সুযোগ গ্রহণ করতে পারল না; তাদের উপর বরঞ্চ শোষণ আরও বেড়ে গেল। দেশে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হল, তাতে ধনীশ্রেণী ও যাদের শিক্ষাদীক্ষা ছিল তারাই সুবিধা করে নিল।

সরকারী কর্মচারীরা ও রাজনৈতিক নেতারা বেশীর ভাগই উঁচু শ্রেণীভুক্ত। ফলে দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোতে

তাদের একচেটিয়া অধিকার বজায় রেখে তারা দেশের উন্নতির পরিকল্পনা চালু করল। দেশে প্রচুর চাকুরির সৃষ্টি হল—নানা প্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও সরকারী বিভাগ স্থাপিত হল। এইসব প্রতিষ্ঠানে তাদেরই সন্তানেরা বেশ সুযোগ সুবিধা করে নিল। গরীব ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের জন্যে লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপদেশ ও বড় বড় বক্তৃতা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই জুটল না। এমন কি প্রাথমিক শিক্ষালাভ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের সামান্য আনুকুল্যও তাদের ভাগ্যে ঘটল না। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগার স্থাপিত হল। কিন্তু গ্রামের দরিদ্র লোকদের জন্য প্রাথমিক বা নৈশ বিদ্যালয় খোলবার বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না। কিছু কিছু আইন দরিদ্র গ্রামবাসীদের নাম করে পাশ করা হল, কিন্তু তার সুবিধা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ধনী ও উঁচু শ্রেণীর লোকেরা ভোগ করে নিল। যেমন সমবেত ঋণ দান সমিতিগুলির টাকা বড়লোকরাই আত্মসাৎ করল। পতিত জমি বণ্টনও করা হল, কিন্তু তা প্রতিপত্তিশালী বড়লোকেরাই পেল। সমাজে ধনী ও গরীবের মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। মুস্কিল হল এই যে দেশের ৯০ ভাগ লোককে বঞ্চিত করে বাকী ১০ ভাগ বেশীদিন তাদের শোষণ চালিয়ে যেতে পারে না। বেশীর ভাগ লোকের পকেটে পয়সা না থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্য তেমন ফলাও হয়ে উঠে না—ধীরে ধীরে বাজার শুকিয়ে যায় এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত ক্রমেই সমাজের গতি ঝিমিয়ে আসে। ভারতবর্ষ আজ এই অবস্থায়ই এসে পৌঁছেছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে ভারতবর্ষের উন্নতি করবার সুযোগ ও সুবিধা আজ যে রকম আছে এমন কোনো দিনও ছিল না। ভারতবর্ষের জমিতে দ্বিগুণ, তিনগুণ ফসল ফলান আজ মোটেই অসম্ভব নয়। শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে কলকারখানা স্থাপন করে শিল্পজাত জিনিসপত্রের উৎপাদন আজ ১০।১২ গুণ অতি সহজেই বাড়িয়ে ফেলা যায়। এই সম্ভাবনাকে

কার্যকরী করতে না পারার প্রধান কারণ ভারতের ভেদমূলক সমাজ-ব্যবস্থা। এত বেশী সুযোগ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এই সমাজ-ব্যবস্থা যখন মানুষকে পঙ্গু করে রাখে এবং সমাজের শাসক ও শোষকরা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হয় না, তখনই আসে সমাজ-বিপ্লব। ইতিহাসের খাতায় ভারতবর্ষের এই একমাত্র ভবিষ্যৎ লেখা হয়ে আছে।

দুই

সাম্রাজ্যবাদের যুগে সমাজের স্তর-বিভেদ ও শোষণ ব্যবস্থা

আমরা আগের অধ্যায়ে দেখলাম কেমন করে আর্যরা ভারতবর্ষে এসে আদিবাসী অনার্যদেব দাস ও শূদ্র শ্রেণীতে পরিণত করল এবং নিজেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণে ভাগ হয়ে গেল। আমরা আরও দেখেছি যে জাতি-ধর্ম, কর্মবাদ ও পুনর্জন্মবাদের সাহায্যে ব্রাহ্মণশ্রেণী সমাজে তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল এবং সমাজে স্তর-বিভেদ সৃষ্টি করে উচ্চ স্তরের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থাকে পাকা করে ফেলেছিল। ইংরেজদের আমলে এই স্তর-বিভেদ আরও শক্তিশালী হল এবং উচ্চস্তরের শোষণ আরও তীব্রতর হল।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণপ্রণালী

ইংরেজের আমলেই ভারতবর্ষে দারিদ্র্যের প্রথম সূত্রপাত হল বলা চলে।

তার আগেও নিম্নশ্রেণীদের উপর শোষণ ছিল। কিন্তু তা 'ধর্মের' নিয়মে বাঁধা থাকায় অনেকটা সংযত ছিল। ইংরেজদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত উচ্চ-স্তরের শোষণ-প্রথার উপর বিশেষ কোনো বিধি-নিষেধ থাকল না। ইংরেজ শাসকেরা ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার নিয়মে বিশ্বাস করত। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশের কর্মকর্তারাও ইংরেজদের কাছ থেকে শেখা ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার নিয়মে স্বভাবতই বিশ্বাসী হলেন; কারণ, এই মতবাদ তাদের শোষণ-প্রথা বজায় রাখবার পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। স্তর-বিভক্ত সমাজে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার প্রথা চালু করা মানেই নিম্নস্তরের লোকদের উপর সীমাহীন শোষণ-ভার চাপিয়ে দেওয়া।

কারণ, বাজারে প্রতিযোগিতায় নীচু শ্রেণীর হার হওয়া সুনিশ্চিত; সামান্য সম্পদ ও শিক্ষা নিয়ে তাদের উঁচুশ্রেণীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সফল হওয়া সম্ভব নয়।

সাম্রাজ্যবাদীদের শাসনের ফলে ভারতবর্ষে এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে স্তর-বিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থা আরও গুরুতর আকার ধারণ করল। কি করে তা হল আমরা এ অধ্যায়ে আলোচনা করব।

ভারতবর্ষ তথা প্রাচীন এশিয়ার সভ্যতা যে এতটা উন্নত হতে পেরেছিল তার প্রধান কারণ ছিল অত্যন্ত উন্নত ধরনের জলসেচন ব্যবস্থা। প্রাচীন যুগের লোকেরা বৃষ্টির জল ধরে রাখার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলাশয় পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাঁধ দিয়ে তৈরি করেছিল। এইসব জলাশয় থেকে নালা কেটে জমিতে জল-সরবরাহ করা হত। এখনও ঐসব বড় বড় জলাশয়ের ধ্বংসাবশেষ ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতে দেখতে পাওয়া যায়। এইরূপ জলসেচনের ব্যবস্থার ফলে জমিতে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত ফসল জন্মাত যা শহরগুলিকে বাঁচিয়ে রাখত ও নানাপ্রকার শিল্পীদের ভরণ-পোষণ যোগাত।

ইংরেজ, ফরাসী, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও স্পেন দেশীয়রা এশিয়ার দেশগুলিকে অধিকার করে নিয়ে তাদের দেশে রপ্তানির জন্য নানারকম কাঁচামাল উৎপাদন আরম্ভ করল। চা, নীল, দারুচিনি, তামাক, নারিকেল ও আখের চাষ তার ভেতর প্রধান ছিল। এইসব উৎপাদনের জন্য তারা বড় বড় "বাগান" (Plantation) তৈরি করেছিল। ঐসব বাগানে প্রায় ক্রীতদাস প্রথায় শ্রমিকদের খাটিয়ে চাষবাস করা হত। এইভাবে এশিয়ার কৃষি দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। একদিকে চাষীরা আগের মত নিজেদের খাবার জন্য খাদ্যশস্যের চাষ করতে লাগল, অন্যদিকে বড় বড় বাগানে, অনেক ক্ষেত্রে চাষীদের ছোট ছোট ক্ষেতেও রপ্তানির জন্য নানারকম ফসল তৈরি হতে লাগল।

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা বড় বড় বন্দর তৈরি করল, রাস্তাঘাট, রেলপথ তৈরি করল ; আমাদের দেশ থেকে কাঁচামাল রপ্তানি ও তাদের দেশ থেকে শিল্পজাত জিনিসপত্র আমদানি করতে লাগল। দেখতে দেখতে এই বন্দরগুলো বড় বড় শহরে পরিণত হল। বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলিকাতা, রেঙ্গুন, কলোম্বো, সিঙ্গাপুর, বাটাভিয়া (জাকার্তা), হংকং, ম্যানিলা, সাংহাই এইভাবে গড়ে উঠল। এইসব শহরগুলোয় আমদানি-রপ্তানির সাহায্যের জন্য ব্যাংক গড়ে উঠল।

শহরগুলিতে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্রমেই খুব জমে উঠতে লাগল। এই বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে দেশের একটা ব্যবসায়ী শ্রেণী বেশ লাভবান হল। এদের প্রধান কাজ হল ইউরোপীয় কম্পানিগুলির জন্য গ্রাম থেকে কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্য কিনে নিয়ে এসে রপ্তানি করতে সাহায্য করা ও বিদেশজাত শিল্পদ্রব্য এদেশের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়া। এইভাবে ইউরোপীয় কম্পানি-গুলির দালাল হিসাবে কাজ করে তারা প্রচুর বিত্তবান হল। ইউরোপীয়রা এশিয়ার বিজিত দেশগুলির উপর তাদের শাসন-ক্ষমতা জোরদার করবার জন্য তাদের অনুগত একদল লোককে চিরস্থায়ীভাবে জমির মালিকানা স্বত্ব দিয়ে দিল। এই নূতন জমিদারশ্রেণী চাষীদের শোষণ করে ধনী হয়ে উঠল। এইভাবে দেশে জমিদার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গেল। এদের শ্রেণী ও ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে থাকল। ভারতবর্ষে আর একটা নূতন শ্রেণী সৃষ্টি হ'ল, তা হ'ল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ইংরেজরা তাদের রাজ্য ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো চালাবার জন্য দেশীয় কর্মচারীদের কিছুটা ইংরেজি শিখিয়ে নিয়ে অল্প বেতনে চাকুরিতে নিয়োগ করল। এইভাবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হল। বলা বাহুল্য এই তিন শ্রেণীর লোকেরা উঁচু জাতির থেকেই বেশীর ভাগ এল। নীচু জাতির লোকেরা যে শোষিত চাষী-মজুর ছিল তাই থাকল,

বরং এখন তাদের উপর শোষণভার আরও কঠিন ভাবে চেপে বসল।

আমদানি-রপ্তানি, বৈদেশিক বাণিজ্য ও তার জন্য পয়সা লেনদেন সাম্রাজ্যবাদের আমলে দেশের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল। সাম্রাজ্য-বাদের আগে দেশেব অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ছিল গ্রামের চাষীদের শস্য উৎপাদন। সে মেরুদণ্ড বৈদেশিক বাণিজ্যের চাপে ভেঙ্গে গেল। প্রথমতঃ ভাবতবর্ষের ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের প্রাচীন উৎপাদন প্রথার নির্ভর ছিল জলসেচন ব্যবস্থার উপর। দেশের রাজত্ব বিদেশীদের হাতে চলে যাওয়ায় জলসেচন ব্যবস্থার তেমন যত্ন নেওয়া আর হল না। জমিদাররা চাষীদের কাছ থেকে কর আদায় করেই তাদের কর্তব্য শেষ করল। তারা গিয়ে বড বড় শহরে থাকতে লাগল—গ্রামের ও চাষ-বাসের উন্নতির দিকে তাদের কোনো উৎসাহ থাকল না। শহরের আমোদ-প্রমোদ ও বিলিতি মদের নেশার ভেতরেই তারা ডুবে রইল। শুধু তাই নয়, ইংরেজরা জমিতে ব্যক্তিগত অধিকার এবং জমি কেনা-বেচার রীতি পুরাপুরি চালু করল। ফলে জমিদার, গোমস্তা, ব্যবসায়ী শ্রেণী এবং সরকাবী ও কম্পানির চাকুরেরা চাষীদের জমি সহজেই হাত করে ফেলল। চাষীদের উচ্চ হারে টাকা ধার দিয়ে, তাদের জমি বন্ধক রেখে, আগাম ফসল কিনে এবং নানা আইনি ও বে-আইনি মতে অজ্ঞ ও দুঃস্থ চাষীদের জমি হাত করা এদের পক্ষে মোটেই কঠিন হল না। এই ভাবে চাষীরা ক্রমে ভাগচাষী ও ভূমিদাসে (bond labour) পরিণত হতে লাগল।

ইংরেজরা জমিদার, জোতদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের মারফৎ চাষীদের মাথায় যে শোষণভার চাপাল, তার ভারে ভারতের কৃষির উন্নতি ত দূরের কথা, দ্রুত অবনতি হতে লাগল। চাষীর হাতে চাষের খরচ-খরচা মেটাবার পর যেটুকু সামান্য উদ্বৃত্ত থাকত তা এরা জমির খাজনা, ঋণের সুদ ও ব্যবসায়ের মুনাফা হিসাবে

চাষীদের হাত থেকে সহজেই নিয়ে নিতে লাগল এবং শহরে বসে বসে বড় বড় বাড়ী তৈরি করে, বিদেশী প্রসাধন দ্রব্য কিনে ও নানাপ্রকার বিলাসিতায় টাকা ব্যয় করতে লাগল। জমির উন্নতির জন্য জল-সেচ ব্যবস্থা চালু রাখা, গ্রামের রাস্তাঘাট, চাষীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষার জন্য কোনো রকম চেষ্টা তারা করল না। ফলে কৃষির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকল। চাষীদের অবস্থার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘাড়ে সুদ ও খাজনার বোঝার চাপ বাড়তে লাগল।

জমির উপর চাপ বৃদ্ধি

এইভাবে ইংরেজরা জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও তাতে কেনা-বেচার ব্যক্তিগত অধিকার স্থাপন ক'রে জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর শোষণ-ব্যবস্থা আইন-কানুন ও পুলিস-বাহিনীর সাহায্যে দৃঢ় করল এবং দেশীয় উৎপাদন প্রথাকে বৈদেশিক বাণিজ্যের আওতায় নিয়ে এসে ভারতের প্রাচীন কৃষি-ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিল। ফলে চাষীর অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে এগিয়ে চলল। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীয় কল-কারখানার উৎপন্ন জিনিসপত্র ব্যবসায়ীরা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে থাকায় গ্রামের কারিগররা বেকার হয়ে যেতে লাগল এবং তারাও এসে জমির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল।

প্রাচীনকালে গ্রাম্য শিল্পগুলি চলতি সমাজ-ব্যবস্থা চালু রাখতে যথেষ্ট সাহায্য করত। বৃষ্টিপাত শুধু বছরের কয়েক মাসের ভেতর সীমাবদ্ধ থাকায় চাষের কাজও ঐ মাসগুলোতেই বেশী করতে হত। অন্যান্য সময়ে চাষীদের উপর তেমন কাজের চাপ থাকত না। বছরে বেশ কয়েক মাস তাদের অবসর থাকত। এই সময়টা নানা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তৈরি করত। যেসব জিনিসপত্র তৈরি করতে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন সেগুলো তৈরি করত গ্রামের কামার, কুমোর, ছুতোর, জোলা, স্বর্ণকার ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ কর্মপটু শ্রেণীর কারিগররা। এরা বারোমাস এইসব কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকত

এবং এদের কাজের পরিবর্তে চাষীরা এদের নির্দিষ্ট পরিমাণে ফসল দিত আর এদের জমি চাষ করে দিত ভাগচাষী হিসাবে। যদি লোকসংখ্যা বেড়ে গিয়ে কোন পরিবারের কেউ বেকার হয়ে যেত তা হলে তারা এইসব কারিগরদের কাছে গিয়ে অবসর মত কাজ করে কিছু আয় করতে পারত। বিশেষ করে সূতা কাটা ও কাপড় বোনা প্রভৃতি কাজ প্রত্যেক চাষীর অবসর সময়টাকে কার্যকরী করতে সাহায্য করত। এইভাবে গ্রাম্য শিল্পগুলি শুধু যে গ্রামের লোকদের একটা বড় অংশের কাজ যোগাত তাই নয়, প্রত্যেক চাষী পরিবারের অবসর সময়টারও উপযুক্ত ব্যবহারের সুযোগ দিত। তখন গ্রামে বেকার বলে কেউ ছিল না। বিশেষ করে যাদের জমি কম ছিল তারাও এইসব গ্রাম্য শিল্পে নিয়োজিত হয়ে বেশ কিছুটা আয় করতে পারত।

ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবের পরে তারা কল-কারখানা স্থাপন করে খুব সস্তায় কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি উৎপন্ন করতে লাগল। এশিয়ার দেশগুলো জয় করে তারা ঐসব সস্তা জিনিসপত্র গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে থাকল। ফলে গ্রামের কারিগররা দলে দলে বেকার হয়ে যেতে লাগল ও বাধ্য হয়ে একমাত্র জীবিকার উপায় হিসাবে জমির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। অতএব গ্রাম্যশিল্প থেকে চাষীদের যে আয় হত তাও নষ্ট হয়ে গেল এবং জমির উপর লোকসংখ্যার চাপ বেড়ে গেল। এই সময় মৃত্যুর হার কমে গিয়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। ফলে জমির উপর চাপ আরও বেশী পড়তে লাগল।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি

প্রাচীনকালে জমিজমার অভাব ছিল না, লোকেরই অভাব ছিল। চাষীদের পরিবারের লোকসংখ্যা যার যত বেশী হত সে তত

সমৃদ্ধিশালী হতে পারত। এই কারণে চাষীরা সন্তান জন্মালে, বিশেষ করে পুত্র সন্তান জন্মালে, খুব খুশী হত। শুধু তাই নয়, মৃত্যুহার খুব বেশী থাকায় যে মার সন্তান যত বেশী, সমাজে সম্মানও তার তত বেশী হত। এইভাবে সমাজের অর্থনৈতিক চাহিদা ও জন্মমৃত্যুর হারের ভেতর সামঞ্জস্য রাখবার জন্য বহুসংখ্যক সন্তানের জন্ম সমাজে বিশেষ কাম্য বলে মনে করা হত। সাম্রাজ্যবাদের শাসনকালে বিলেতের অনুকরণে এখানেও স্বাস্থ্যরক্ষা বিভাগ স্থাপিত হল। বিশেষ করে ম্যালেরিয়া, কলেরা, প্লেগ ইত্যাদি সংক্রামক ব্যাধিগুলির প্রকোপ অনেকটা রোধ করা হল প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ফলে মৃত্যুসংখ্যার হার বেশ কিছুটা কমে গেল—কিন্তু জন্মসংখ্যার হার সমান ভাবেই চলতে লাগল। সুতরাং লোকসংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলল এবং জমির উপর চাপও বেড়ে যেতে থাকল।

কৃষি ও শিল্পের ভেতর অসামঞ্জস্য

সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় আঘাত হল—কৃষি ও শিল্পের ভেতর যে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য ছিল তা নষ্ট করে দেওয়া। প্রাচীন ভারতের শিল্পগুলি দুই ধরনের ছিল। শহরের শিল্প ধনী শ্রেণীর বিলাসিতার জন্য জিনিসপত্র তৈরি করত। শহরের কারিগররা রেশম, হাতির দাঁতের কাজ, সোনা-রূপোর কাজ, সূক্ষ্ম সূচীর কাজ, কাঠ-খোদাইএর কাজ, জহুরীর কাজ ইত্যাদি নানাপ্রকার কারু-শিল্পে দক্ষতা ও খ্যাতিলাভ করেছিল। সমুদ্র ও নদীর পারের বন্দরগুলিতে জাহাজ ও নৌকা তৈরির কাজেরও তখন বিশেষ উন্নতি হয়।

গ্রামের কারিগররা চাষীদের ব্যবহার্য ও চাষের কাজে লাগে এমন সব জিনিসপত্র তৈরি করত; যেমন লাঙ্গল, বাড়ীঘর, বাসনপত্র, মোটা কাপড়, মেয়েদের গয়নাগাটি ইত্যাদি।

শহরের ও গ্রামের কারিগররা এবং শহরের রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য শ্রমিকরা চাষীদের উদ্বৃত্ত ফসলের উপর নির্ভরশীল ছিল; যেমন নির্ভরশীল ছিল চাষীরা গ্রামের কারিগরদের ও রাজাদের জলসেচ ব্যবস্থার উপর। তখন যথেষ্ট উদ্বৃত্ত ফসল থাকায় গ্রামের ও শহরের এইসব শ্রেণীগুলি গ্রামেরই ফসলের উপর নির্ভর করে বাঁচতে পারত। এইরূপে গ্রাম ও শহরের ভেতর এবং শিল্প ও চাষের ভেতর একটা পরস্পর লেনদেনের সম্বন্ধ ও নির্ভরশীলতা স্থাপিত হয়েছিল।

বিলেত থেকে কারখানায় তৈরি শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানির ফলে ভারতের কারিগরী শিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে গেল। তাই বহু সংখ্যক লোক বেকার হয়ে পড়ল ও চাষীদের অবসর সময়ের আয়ের পথও নষ্ট হয়ে গেল। ফলে জমির ও জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য খরচ করা ত দূরের কথা চাষীদের জীবন ধারণের খরচেই অকুলান ঘটল। কৃষি ও শিল্পের ভেতর যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ছিল, যার ভিত্তিতে ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা স্থাপিত বিদেশী মালের আমদানি ও কাঁচামালের রপ্তানি প্রথার চাপে সে-ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেল। খাদ্যশস্য উৎপাদন আগের মতনই চলতে লাগল। তার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে রপ্তানির জন্য কাঁচামাল উৎপাদনও চলল। গ্রাম্য শিল্প ধ্বংস হয়ে চাষীদের যে ক্ষতি হয়েছিল তার আংশিক পূরণ হতে পারত কাঁচামাল উৎপাদন বাড়িয়ে। কিন্তু জমির খাজনা, দেনা এবং ব্যবসায়ীদের শোষণের ফলে এইসব নূতন ফসল উৎপাদনের লাভ চাষীরা পেল না; তা ভোগ করল উঁচু শ্রেণীর লোকেরা।

কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যে প্রাচীন নির্ভরশীলতার ব্যবস্থা ছিল তা এইভাবে জমিদারী ও বহির্বাণিজ্যের সৃষ্টি করে ইংরেজরা ধ্বংস করে দিল। ফলে চাষীর উপর দারিদ্র্যের চাপ বাড়ল কিন্তু জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর সুবিধা হল।

ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল থেকেই সওদাগর শ্রেণী ছিল।

তারা সাম্রাজ্যবাদের এই নূতন ব্যবসায়ের সুযোগ নিয়ে দ্রুত প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠল। তাদের ভেতর কেউ কেউ এদেশে কল-কারখানা স্থাপন করে প্রথম কারখানা-শিল্পের পত্তন করেছিল। এরাই হল আমাদের দেশের প্রথম কারখানা-শিল্পের বুর্জোয়া শ্রেণী। এই শ্রেণীর সঙ্গে ইংরেজদের দেশের কল-মালিকদের বিরোধ লেগে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক; এবং যতই এরা তাদের স্থানীয় সুবিধা ও সস্তা মজুর খাটিয়ে ইংরেজ কলমালিকদের হটিয়ে দিতে লাগল ততই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এদের বিরোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হ'য়ে উঠতে থাকল।

অন্যদিকে ইংরেজরা অল্প মাইনে দিয়ে কেরানী তৈরির জন্য ভারতীয়দের ইংরেজি শিক্ষা দিতে লাগল। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষার ফলে বিলাতের রাজনৈতিক মতবাদগুলোও আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত লোকেরা শিখে নিল। ফলে জাতীয়তাবাদী ও বৈপ্লবিক মতবাদ শিক্ষিত শ্রেণীর ভেতর বেশ চালু হ'য়ে গেল এবং তারা ক্রমেই ইংরেজদের বিরোধিতা করতে লাগল। এই শিক্ষিত শ্রেণী অবশ্য বেশীর ভাগই উচ্চশ্রেণীর লোক ছিল এবং তারা আমাদের দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্ব সহজেই নিয়ে নিল।

কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বাধীনতা আন্দোলন বিশেষ জোরদার হল না যতদিন অবধি তারা ভারতের চাষী মজুরদের এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে না টানতে পারল। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে চাষী মজুররা যোগ দেওয়ায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এক বিরাট শক্তিশালী গণ অভ্যুত্থানে পরিণত হ'ল এবং ভারতের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত ক'রে তুলল।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হল ও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে শাসন-ক্ষমতা ভারতীয় নেতাদের হাতে এসে পড়ল। ১৯৫১ সালে ভারতের নূতন রাষ্ট্রীয় মৌলিক সংবিধান তৈরি হল; তাতে জনসাধারণের উন্নতির জন্যে বড় বড় অনেক কথা

লেখা হল কিন্তু কাজের বেলা অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা বিশেষ কিছু বদলাল না। সমাজের স্তরবিভেদ আগের মতই বজায় থাকল। উঁচু স্তরের লোকদের হাতেই ক্ষমতা ও সরকারী-ব্যবস্থা চালু করার ভার থেকে গেল। তারা দেশের উন্নতির নাম করে আরও উগ্রভাবে চাষীদের ও শ্রমিকদের শোষণ করতে লাগল। ভারতের প্রাচীন সামাজিক স্তরভেদ ও নীচু শ্রেণীর উপর শোষণ স্বাধীনতার যুগে বিন্দুমাত্র ত কম হলই না বরং আরও উগ্র হতে লাগল। যে অর্থনৈতিক উন্নয়নপন্থা ভারতবর্ষ বেছে নিল, তাতে দরিদ্র জনসাধারণকে উন্নয়নের কঠোর দাম দিতে হল; যদিও ফল ভোগ করবার বেলা তাদের কথা কেউ মনেও আনল না; উঁচু বর্গের লোকের মধ্যেই উন্নয়নের শুভফল সীমাবদ্ধ থাকল। পরের অধ্যায়ে আমরা ভারতবর্ষের এই উন্নয়ন-পন্থা নিয়ে আলোচনা করব।

দ্বিতীয় ভাগ

ভারতের উন্নয়ন-পদ্ধতি

তিন

ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পন্থা

ভারতের সংবিধানে (Constitution) রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হিসাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

"ভারত সরকার বিশেষরূপে চেষ্টা করবে যেন :

(ক) স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ভারতের প্রত্যেক নাগরিক উপযুক্ত জীবিকা অর্জন করবার অধিকার পায়।

(খ) ভারতের ধনসম্পদ এমনভাবে বণ্টন করা হয় যাতে এই ধনসম্পদের উপর অধিকার ও ক্ষমতা সকলের জন্য ব্যবহৃত হয়।

(গ) ভারতের উৎপাদন-ব্যবস্থা এরূপভাবে চালু করা হয় যাতে উৎপাদনের উপায়গুলি ও ধন-সম্পত্তি কয়েক জনের মুষ্টিগত না হয় এবং জনসাধারণের ক্ষতিকর ভাবে ব্যবহৃত না হয়।"

প্রায় ত্রিশ বছর হতে চলল ভারত স্বাধীন হয়েছে। এই দীর্ঘ তিন দশকের ভেতর ভারতে সংবিধানের এই মৌলিক নির্দেশ ঠিক উল্টোভাবে কাজে লাগান হয়েছে। ভারতে ধনী ও গরীবের ব্যবধান ত কমেইনি বরং অনেক বেড়ে গেছে। কলকারখানার মালিকানা মুষ্টিমেয় কয়েকটি বড় বড় ধনী পরিবারের করতলগত হয়েছে। রাজারা ও বড় বড় জমিদারেরা আর নেই বটে, তবে জমির মালিকানা দরিদ্র ও নীচু শ্রেণীর কৃষকেরা খুব কমই পেয়েছে। উঁচু শ্রেণীর শিক্ষিত চাকুরেরা, সুদখোর মহাজনেরা ও ব্যবসায়ীরা জমি দখল করে নিয়েছে। আমরা আগেই দেখেছি, দেশের শতকরা ৫৪ জন লোক দারিদ্র্যের সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ে নেমে গেছে।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবার নিয়ন্ত্রণের নীতি

ভারতের এই ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের জন্য অনেকে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিকে প্রধানতঃ দায়ী করেন। ভারতের লোকসংখ্যা ১৯৬১

সালে ছিল ৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ। ১৯৭১ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৫৪ কোটি ৭৯ লক্ষে। এই দশ বছরে লোকসংখ্যা প্রতি বছর প্রায় ১ কোটি ৯ লক্ষ হারে বাড়ে। একথা ঠিক যে লোকসংখ্যা যদি এত বেশী না বাড়ত, তাহলে লোকের মাথাপিছু আয় আরও কিছু বেশী হত। কিন্তু ভারতে সম্পদ ও আয় বিলি-বণ্টনের যে ব্যবস্থা চালু আছে, তাতে গড়পড়তা হিসাবে উৎপাদন ও আয় যাই হোক, গরীব লোকের কপালে দারিদ্র্য ছাড়া আর কিছুই জুটত না।

গরীবের সংসারে বরং ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা সংসারে অনেক কাজে সাহায্য করে। যার ফলে বাপ-মার মাঠে বা কারখানায় কাজ করা সম্ভব হয়। ছেলে-মেয়ে না থাকলে মাকেই সংসার দেখতে হত। ফলে দরিদ্র পরিবারের আয় অর্ধেক হয়ে যেত। দরিদ্র পরিবারে ছেলেপুলে থাকলে যে তাদের দারিদ্র্যের কিছু বেশী তারতম্য হয় তা নয়। তবে একথা ঠিক যে সমগ্র জাতির পক্ষে যত লোকসংখ্যা বেশী হবে তত খাই-খরচাও বাড়বে, আর যদি উৎপাদন সেই পরিমাণে না বাড়ে তবে মাথাপিছু আয় নিশ্চয়ই কমে যাবে। ভারতের উৎপাদনের হার অত্যন্ত কম। এত কম উৎপাদনের স্তর থেকে উৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধি মোটেই কষ্টকর হওয়া উচিত নয়। সুতরাং আমাদের দেশের দারিদ্র্য বাড়বার আসল কারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, উৎপাদন দ্রুত না বৃদ্ধি পাওয়া। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির উপর দোষ চাপিয়ে নিজেদের সাফাই না গেয়ে এইসব পণ্ডিত ও কর্মকর্তাদের উচিত, ভাল করে বিবেচনা করে দেখা কেন আমাদের দেশের উৎপাদন এত আস্তে আস্তে বাড়ছে। এই কথাটা ভাল করে বিবেচনা করে দেখলে তাঁরা দেখতে পেতেন যে ভারতে যে খিচুড়ি পন্থার উৎপাদন-নীতি তাঁরা চালু রেখেছেন, সে নীতির আওতায় দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়া কোনো কারণেই সম্ভব নয়।

আমরা দেখেছি যে, প্রাচীনকালে জন্মের হার, মৃত্যুর হার ও

উৎপাদনের চাহিদার ভেতর সামঞ্জস্য রাখবার জন্য সমাজে সন্তান জন্মের সব রকম উৎসাহ দেওয়া হত। মানুষের মনে হাজার হাজার বছরের শিক্ষার ফলে সন্তানের জন্ম, বিশেষ করে পুত্রের জন্ম, যে বিশেষ বাঞ্ছনীয় সে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। বার্ধক্যের সময় পুত্র কন্যার উপর নির্ভর ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর না থাকায়, সন্তানের জন্মদান বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করা স্বাভাবিক। তাছাড়া গরীবের ঘরে বিশেষ করে গ্রামে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দ্বারা সংসার চালাতে অনেক সাহায্য হয়। সুতরাং রাতারাতি জন্মনিবোধ চালু হয়ে যাবে, এ আশা করা বাতুলতা মাত্র। ইউরোপ ও জাপানের জনসংখ্যার ইতিহাসে দেখা গেছে যে শিল্প-বিপ্লবের পরে এবং ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তারের পরই ধীরে ধীরে জন্মের হার কমতে সুরু করে, তার আগে নয়। ভারতের কর্মকর্তারা একদিকে জনসাধারণকে অশিক্ষিত রেখে শুধু শোষণের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে, আবার অন্যদিকে আশা করছে যে তারা সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী ব্যক্তিদের ন্যায় জন্মরোধ করবে। দেখা গেছে জন্মরোধ সেইসব পরিবারই করে বিশেষ করে যাদের স্ত্রীরা শিক্ষিত ও যারা উন্নতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাখে। নিরক্ষর, মূর্খ, জীবনের সব রকম আশা-আকাঙ্ক্ষা-হীন—মাত্র একবেলা কিছুটা খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা ছাড়া যাদের আর কোনো উদ্দেশ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই, তাদের কাছ থেকে জন্মনিরোধ আশা করা নিরর্থক।

আমাদের দেশের জন্মের হার ১৯১১ সাল থেকে ১৯৩০ সালের দশকে ছিল জন-সংখ্যার প্রতি হাজারে ৪৬৪। ১৯৬১-৭০ এর দশকে এই হার সামান্য কমে গিয়ে ৪১'১ এ দাঁড়ায়। এই একই সময়ে মৃত্যুর হার ৩৬৩ থেকে কমে দাঁড়ায় ১৮৯ এ। জন্মের হার হাজারে ৫৩ কমাতে গিয়ে গত ২৯ বছরে কোটী কোটী টাকা পরিবার পরিকল্পনার কাজে ব্যয় করা হয়েছে। এই সব কাজে উঁচু শ্রেণীর

অনেকের চাকুরি হয়েছে এবং বেশ দু পয়সা উপার্জনও হয়েছে সত্য, কিন্তু জন্মনিরোধ কতটা হয়েছে সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ আছে। যেটুকু জন্মের হার কমেছে তা শিক্ষার প্রসার, শিল্পের বিস্তার ও শহরের প্রতিপত্তি বাড়বার জন্যই হওয়া সম্ভব। এই টাকা জন্ম নিরোধের কাজে খরচ না করে শিক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে খরচ করলে দেশে জনসংখ্যা আরও কম হয়ে যেত আপনা থেকেই।

আমাদের সামনে যে সমস্যা গুরুতর ভাবে দেখা দিচ্ছে সেটা উৎপাদন বাড়াবার সমস্যা, জন্মনিরোধের সমস্যা নয়। উৎপাদন কেন বাড়ছে না সেটা বিচার করে দেখতে গেলে আমরা দেখব যে ভারতের প্রাচীন উচ্চ নীচ স্তরবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থাকে বজায় রেখে খিচুড়ি পন্থায় অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টাই উৎপাদনের এই মন্দ গতির কারণ।

ভারতে ভারী শিল্পের প্রতিষ্ঠা

ভারত স্বাধীন হবার পর ভারতের নেতারা আশা করেছিলেন যে, যদি দ্রুত কল-কারখানা তৈরি ক'রে দেশে শিল্প-বিপ্লব আনা যায়, তাহলেই দেশের দারিদ্র্য ঘুচবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ শক্তিশালী ও অর্থনৈতিক ভাবেও স্বাধীন হবে। সে অনুযায়ী বড় বড় কারখানা সৃষ্টি ক'রে দ্রুত ভারী-শিল্প প্রতিষ্ঠা করার একটা উন্নয়ন পরিকল্পনা তাঁরা তৈরি করেন। একশ বছরের বেশী ভারতবর্ষের জনসাধারণ ইংরেজের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হলে দেশে খুব শীঘ্র শীঘ্র ভারী শিল্প তৈরি করার প্রয়োজনও ছিল। ভারতের নেতারা তাই সহজেই এই পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে নিলেন।

কিন্তু এই পরিকল্পনার অনেক খুঁত ছিল; যেমন পরিকল্পনাকে কাজে লাগাবার ব্যাপারে বিস্তারিত কর্মপদ্ধতি কিছু ছিল না।

বিদেশী মুদ্রা আয়ের সম্বন্ধে ও কলকারখানা স্থাপনের জন্য কি ক'রে মূলধন সংগৃহীত করতে হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ কিছু ছিল না। তথাপি এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশে একটা দৃঢ় শিল্পের ভিত্তি-স্থাপন করা এবং সে উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সফল হয়েছে। কোনো কোনো মৌলিক শিল্পে ভারতবর্ষ দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ উৎপাদন বাড়িয়েছে।

এত তাড়াতাড়ি এতটা উন্নতি সম্ভব হত না যদি এইসব শিল্প রাষ্ট্রের হাতে না নিয়ে নেওয়া হত। ভারতের পুঁজিবাদীদের পক্ষে মৌলিক শিল্পগুলির জন্য যে পুঁজি দরকার হয়েছিল তা যোগাড় করা সম্ভব ছিল না। তাদের দক্ষতা আর উৎসাহেরও অভাব ছিল। বাজারের উপর নির্ভর করলে এবং রাষ্ট্রের নেতৃত্বে জোর করে স্থাপন না করলে এই শিল্পগুলি এত দ্রুত ভারতবর্ষে স্থাপিত হত না। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী শিল্প স্থাপন করলে বিলাসিতার জিনিস-পত্রের শিল্পগুলিই আগে তৈরি হত। কারণ চাষীদের শোষণ করে ধনীশ্রেণী যে সম্পদ যোগাড় করেছিল তা নানাপ্রকার বিলাসিতায় ব্যয় করবার জন্য তারা উৎগ্রীব হয়ে ছিল। পুঁজিপতিদের উপর নির্ভর করলে ঐসব জিনিসপত্র তৈরিই সবচেয়ে আগে হত। কারণ, সেই সব জিনিসপত্রের চাহিদার সম্বন্ধে তাদের কোনো সন্দেহ ছিল না এবং ঐগুলো তৈরি করলে তাদের লাভ অনেক বেশী হত।

ভারতবর্ষে কলকারখানা স্থাপনের জন্য যে পুঁজি দরকার তার অভাব আছে। সুতরাং যদি বিলাসিতার জিনিসপত্র তৈরির জন্য সব পুঁজি নিয়োজিত হয়ে যায় তাহলে জাতির উন্নতির জন্য ও দরিদ্র জনসাধারণের ব্যবহার্য জিনিসপত্র তৈরির জন্য কোনো পুঁজি আর অবশিষ্ট থাকে না।

মিশ্র উন্নয়ন-পন্থার কুফল

একদিকে যেমন ভারী-শিল্প সরকারী অধিকারে ও উৎসাহে স্থাপিত হল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার অন্যান্য শিল্পগুলি পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত অধিকারে ছেড়ে দিল। এই খিচুড়ি পন্থা অনুযায়ী অর্থ নৈতিক কাঠামোর একভাগ থাকল সরকারের হাতে, আর একভাগ দেওয়া হল পুঁজিপতিদের হাতে। সরকারী ভাগের উদ্দেশ্য থাকল দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি, দেশের উৎপাদন কাঠামোকে শক্তিশালী করা ও জনসাধারণের আর্থিক সংস্থান বৃদ্ধি করা। পুঁজিপতিদের হাতে যেঅংশ থাকল তা তাদের নিজেদের মুনাফা বাড়াবার জন্য তারা ব্যবহার করতে লাগল। দেশের উন্নতি, জনসাধারণের বেকারী দূর করা বা তাদের আর্থিক সঙ্গতি বাড়ানো এসব জাতীয় উদ্দেশ্যের ব্যাপারে তারা মাথা ঘামাল না। তাদের লাভের অংকের দিকেই একমাত্র নজর থাকল।

কিছুটা উন্নতি লাভ করবার পরই এই দুই ব্যবস্থার ভেতর সংঘাত আরম্ভ হল। পুঁজিপতিরা স্বভাবতঃ যেসব শিল্পে চাহিদা বেশী সেইসব শিল্পের দিকে নজর দিল। কারণ, এইসব শিল্পে লাভের সম্ভাবনা বেশী। বাজারের চাহিদার পিছনে থাকা চাই টাকার জোর। লোকের অভাব দূর করার জন্য প্রয়োজন বলে যে-চাহিদা সে-চাহিদা বাজারের চাহিদা নয়; পকেটে টাকাওয়ালা-লোকেদের চাহিদাই হল পুঁজিপতিদের কাছে আসল চাহিদা। কাজেই, টাকাওয়ালা লোকেদের যেসব জিনিসপত্র দরকার সে সব তৈরির দিকেই তারা বেশী মনোযোগ দিল। এর ফলে উৎপাদন কাঠামোতে পুঁজিবাদীদের অংশে ধনীদের চাহিদা মেটাবার জন্য বিলাসিতার জিনিসপত্রই তৈরি হল বেশী। জাতীয় সম্পত্তির এইরূপ অপব্যবহারই হল এই মিশ্র পন্থার প্রথম কুফল।

দ্বিতীয় কুফল হল সমাজের নৈতিক ভিত্তিতে ভাঙ্গন। সরকারী অংশে (Public Sectorএ) দেশের উন্নতির জন্য ভারী-

শিল্প যেমন,—ইস্পাত, কলকব্জা ইত্যাদি তৈরী বেশী হতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে কল-কারখানা চালু করবার জন্য কাঁচামাল ও বিভিন্ন কলকব্জা এবং দক্ষ কারিগর ও ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদির দরকার হল। এইসব জিনিসপত্রের ও কারিগরের ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশ গুলিতে খুব অভাব আছে। বিদেশ থেকে এইসব জিনিসপত্র কিনতে গেলে বিদেশী মুদ্রা লাগে। তারও অভাব প্রচুর। কাজেই এই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, কলকব্জা, দক্ষ কারিগর ও বিদেশী মুদ্রার বণ্টন নিয়ে পুঁজিবাদীদের সঙ্গে সরকারী অংশের প্রতিযোগিতা বেধে যায়। পুঁজিবাদীদের নিজেদের ভেতরও কে কত কম মূল্য দিয়ে কত বেশী প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হাত করতে পারবে তারই চেষ্টা চলতে থাকে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলেই আরম্ভ হয় ঘুষ ও দুর্নীতি। যদি দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজিবাদী অংশ না থাকত এবং সব উৎপাদন-কাঠামো জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসাবে সরকারের দখলে থাকত, তাহলে দুর্নীতি ও ঘুষখোরদের প্রতিপত্তি এতটা বেশী হতে পারত না, ঘুষদাতা ও ঘুষখোর দুইয়েরই প্রতিপত্তি কম হয়ে যেত। সমাজে ঘুষ ও দুর্নীতি বৃদ্ধির প্রধান কারণ হঠাৎ সরকারী চাকুরেদের ও জনসাধারণের নৈতিক অধঃপতন নয়; প্রধান কারণ পুঁজিবাদী প্রথায় সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার একটা বড় অংশ চালু রাখা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই সমাজে ঘুষদাতার ও ঘুষখোরের জন্ম দিয়ে থাকে। ঘুষদাতা থাকলে ঘুষখোরও থাকে এবং ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য ব্যবসায়ী ও পুঁজিবাদীরা থাকলে ঘুষদাতাদেরও অভাব হয় না। তাই পুঁজিবাদী কলকারখানার মালিক ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে সরকারী কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতাদের ঘুষ খাওয়া, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করা একটা জাতিগত সংক্রামক ব্যাধি হয়ে দাঁড়াল। পুঁজিপতিরা ও ব্যবসায়ীরা যখন সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে অসৎ উপায়ে কোটী কোটী টাকা লাভ করতে লাগল, তখন সরকারী কর্মচারীরা ও রাজনৈতিক নেতারা

অনেক বেশী বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে সামান্য আয় করে কঠোর জীবন যাপন করা নির্বুদ্ধিতার কাজ বলেই মনে করতে লাগল। অন্যদিকে মূল্য-বৃদ্ধির ফলে সরকারী বেতনে সংসার চালান ক্রমেই দুরূহ হয়ে পড়তে লাগল, ফলে ব্যবসায়ীরা যখন টাকার থলি নিয়ে এদের প্রলুব্ধ করতে থাকল, তখন তাদের অনেকের পক্ষেই ঐ প্রলোভন সংবরণ করা সম্ভব হল না। ধীরে ধীরে, স্তরে স্তরে সরকারী কর্মচারীরা ও রাজনৈতিক নেতারা ঘুষের পথে পা বাড়াল ও তাদের কর্তব্যজ্ঞান ও দেশাত্মবোধ নষ্ট হয়ে গেল।

ক্রমে ক্রমে সমাজে নীতিজ্ঞানহীনতা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। শুধু যে কল-মালিক, ব্যবসায়ী ও কনট্রাকটর ও সরকারী কর্মচারীরা এই দুর্নীতির জালে জড়িয়ে পড়ল তা নয়, ছাত্র, শিক্ষক, এমন কি শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর ভিতরও এই দুর্নীতির প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। এই জাতিগত অধঃপতনের জন্য প্রকৃতপক্ষে সরকারী কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতারা দায়ী নয়; আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে খিচুড়ি পন্থা গ্রহণ করা হয়েছে তাই প্রধানতঃ দায়ী।

মিশ্র পন্থার তৃতীয় কুফল হ'ল দ্রুত সব জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়া। এরকম হঠাৎ খুব বেশী দাম বেড়ে যাওয়াকে বলে মুদ্রাস্ফীতি। আমরা পরের অধ্যায়ে মুদ্রাস্ফীতির কারণ নিয়ে আলোচনা করব।

চার

মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল

পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাবে কি ভয়ানক ভাবে আমাদের দেশে গত কয়েক বছর ধরে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৬০-৬১ সালের গড়পড়তা দামকে যদি ১০০ ধরা যায়, তাহলে ১৯৭২-৭৫ সালে দাম দাঁড়ায় ২৫৪ এবং ১৯৭৪-৭৫ সালের দাম দাঁড়ায় ৩১৪। অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সালের দাম আড়াইগুণ এবং ১০৭৪-৭৫ সালে তিনগুণেরও বেশী হয়ে যায়।

জিনিসপত্রের দাম বাড়ার ফলে টাকার মূল্যও কমে যায়। ১৯৫০-৫১ সালের তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সালের টাকা এক সিকির সমান হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ সালে এক সিকিতে যা কিনতে পাওয়া যেত, ৭৪-৭৫ সালে তা এক টাকা দিয়ে কিনতে হয়। সরকার যদি অতিরিক্ত পরিমাণে টাকার নোট ছাপিয়ে বাজারে ছাড়ে তবে জিনিসপত্রেব দাম বেড়ে যেতে থাকে। এই অতিরিক্ত টাকা বাড়তির ফলে যে দাম বেড়ে যায় তাকে বলে মুদ্রাস্ফীতি। মুদ্রাস্ফীতি শুধু টাকার সংখ্যা বাড়লেই হয় না, জিনিসপত্রের বিশেষ করে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বা আমদানি যদি কম হয়ে যায় এবং টাকার সংখ্যা যদি সেই পরিমাণে না কমে তা হলেও মুদ্রাস্ফীতি হয়।

যেমন কোন্ জিনিস বাজারে এসেছে ১০০টা আর বাজারে টাকা আছে ২০০ টাকা, তাহলে গড়পড়তা এক একটা জিনিসের দাম হবে ২ টাকা করে। এখন যদি জিনিসের সংখ্যা আগের মত ১০০টাই থাকে, কিন্তু টাকার সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ৪০০ টাকা হয়ে যায়, তাহলে জিনিসের দাম হয়ে যাবে ৪ টাকা করে এক একটা। আবার যদি জিনিসের উৎপাদন বা বাজারে আমদানি কমে গিয়ে ১০০ টার জায়গায় হয়ে যায় ৫০ টা এবং টাকার সংখ্যা ২০০ টাকাই থাকে,

তাহলেও গড়পড়তা দাম বেড়ে গিয়ে এক একটা জিনিসের দাম ২ টাকার জায়গায় ৪ টাকা হয়ে যাবে। সুতরাং দেখতে পাচ্ছি যদি জিনিসপত্রের বাজারে আমদানি কমে যায় কিংবা টাকার সংখ্যা বেড়ে যায় তাহলে জিনিসপত্রের দামও বেড়ে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। মুদ্রাস্ফীতি বা দ্রুত জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কারণ হল টাকার সংখ্যা জিনিসপত্রের আমদানির থেকে বেশী দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ

এখন প্রশ্ন হল সরকার কেন যতখানি উচিত তার থেকে বেশী টাকা বাজারে ছাড়তে বাধ্য হয়?[১] টাকা ছাপান ত সম্পূর্ণ সরকারের হাতে, সুতরাং ইচ্ছা করলেই ত সরকার টাকার সংখ্যা কম রাখতে পারে। আসল কথা, ইচ্ছা থাকলেও সরকার সব সময় টাকার সংখ্যা না বাড়িয়ে পাবে না। এ কথা ভারত সরকারের পক্ষে বিশেষ করে খাটে। স্বাধীন হবার পরেই ভারত সরকার দেশের নানারকম উন্নয়নের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিল এবং সেইসব পরিকল্পনাকে কাজে লাগাবার জন্য প্রচুর পুঁজির দরকার হল। এই পুঁজির যোগাড় করবার জন্যে খাজনা ও নানাবিধ কর ও শুল্ক বসান হল। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকেরা বেশীর ভাগ গরীব, তাদের বেশী ক'রে কর দেবার ক্ষমতা ছিল না। যারা ধনী, উচ্চ শ্রেণীর লোক তাদের উপর পরিমাণমত কর বসান হল না এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বসান হলেও নানা উপায়ে তারা কর দেওয়ায় ফাঁকি দিতে লাগল। ফলে সরকারের যা আয় হল তা থেকে ব্যয় অনেক বেশী

১। ১৯৫১ সালে বাজারে টাকার পরিমাণ ছিল ১,৮০৩ কোটী। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১২,১৭৫ কোটীতে। অর্থাৎ এই কয় বছরে টাকার পরিমাণ ৬ গুণ বেড়ে গেছে। জিনিসপত্রের উৎপাদন এই সময়ের ভেতর বাড়ে মাত্র দ্বিগুণের একটু বেশী।

হয়ে গেল। সরকার ব্যয় করতে গিয়ে বাজারে অনেক টাকা ছাড়ল, কিন্তু কর আদায় করে সেই পরিমাণ টাকা আবার বাজার থেকে তুলে নিতে পারল না। ফলে বাজারে মুদ্রার সংখ্যা বেশী হয়ে গেল এবং জিনিসপত্রের দাম বাড়তে শুরু করল। জিনিসপত্রের দাম বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে মজুতদারদের আবির্ভাব হল। মজুতদাররা দেখল যে, যে হারে জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে তাতে যদি তা কিছুদিনের জন্য ধরে রাখা যায়, তাহলে অনায়াসেই অনেক বেশী দামে বিক্রী করে প্রচুর লাভ করা যাবে। কাজেই তারা যে যা পারল, মজুত করে রাখল। ফলে বাজারে জিনিসপত্রের আমদানি আরও কমে গেল এবং দাম আরও বেশী বৃদ্ধি পেল। এর উপর কয়েক বছর বৃষ্টি কম হওয়ায় খাদ্যশস্যের উৎপাদনও কিছুটা কম হল। সেই সুযোগ নিয়ে বড় বড় চাষী, জোতদার ও মহাজনরা খাদ্যশস্য মজুত করে ফেলল। ফলে খাদ্যশস্যের দাম খুব বেড়ে গেল।

খাদ্যশস্যের দাম বাড়বার ফলে অন্যান্য সব জিনিসেরও দাম বৃদ্ধি পেল। এইভাবে একবার দাম বাড়া আরম্ভ হলে মজুতদারদের তৎপরতার ফলে দাম ক্রমে ক্রমে বেড়ে যেতেই থাকে। দাম বাড়া বন্ধ করা তখন ভীষণ মুস্কিল হয়ে পড়ে।

ভারবতর্ষে মুদ্রাস্ফীতির আর একটা কারণ হল সরকারী ও ধনী শ্রেণীর অপচয়। দেশের উন্নতির নামে কর্তৃপক্ষ নানা প্রকার প্রতিষ্ঠান, উৎসব ও অনুষ্ঠান চালু করে থাকেন। দেশে শিক্ষা-দীক্ষা বাড়বে, কৃষ্টির উন্নতি হবে, লোকের ধর্মভাব বাড়বে, জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি পাবে ইত্যাদি নানা অজুহাতে নানারকম প্রতিষ্ঠান তাঁরা স্থাপন করেন, নানা প্রকার জাঁকজমক ও সমারোহের সৃষ্টি করেন এবং এই সব কাজে তাঁরা কোটী কোটী টাকা খরচ করেন। কিন্তু উৎপাদন বাড়াবার কাজে এই সব প্রতিষ্ঠান ও সমারোহের অবদান খুবই সামান্য। এই সব প্রতিষ্ঠান ও সমারোহ শুধু টাকার স্রোতই

বাড়ায়, উৎপাদন বৃদ্ধি করে না ; এবং এই সব খরচের ফলে জিনিস-পত্রের চাহিদা বাড়ে ও দাম বেড়ে যায়।

সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির কারণ হিসাবে আমরা ধরতে পারি যে সরকারের ধনী ও উঁচু শ্রেণীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন না করা ; ধনী শ্রেণীর হাতে যে উদ্বৃত্ত টাকাটা আছে সেটা কর হিসাবে নিয়ে না নেওয়া ; সে টাকাটা উৎপাদনের কাজে না লাগিয়ে বাজারে অপচয় করতে দেওয়া এবং জিনিসপত্র বিশেষ করে খাদ্যশস্য মজুত করার জন্য সে টাকাটা ব্যবহার করতে দেওয়া,—এইগুলোই আমাদের দেশের মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ। এর পেছনে রয়েছে অবশ্যই আমাদের দেশের খিচুড়ি উৎপাদন কাঠামো।

পুঁজিপতিদের হাতে দেশের উৎপাদন কাঠামোর বড় একটা অংশ দিয়ে দিলে তাদের পুঁজির ব্যবহার ও উৎপাদনের উপর সমাজের কোনো অধিকার থাকে না। ফলে তাদের ঐ পুঁজি উৎপাদনের কাজে না লাগিয়ে মজুতদারির কাজে লাগায় ও আয়ের হিসাব নিকাশ গোপন করে রেখে, উচিত কর না দিয়ে তারা ফাঁকি দিতে থাকে। তাছাড়া পুঁজিপতিরা, রাজনৈতিক নেতারা ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা সকলেই একশ্রেণীর লোক হওয়াতে পরস্পরের প্রতি এদের গভীর সহানুভূতি থাকে এবং কর ফাঁকি দিতে এরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। ফলে, বাজার থেকে কর হিসাবে সরকার যতখানি টাকা তুলে নিতে পারত তা থেকে অনেক কম টাকা তুলে নিতে সক্ষম হয়।

মিশ্র উৎপাদন-ব্যবস্থা যদি না চালু থাকত, যদি সমস্ত উৎপাদন যন্ত্র, কল-কারখানা ও পুঁজির একটা মোটা অংশ ব্যক্তিগত অধিকারে না থেকে সমাজের অধিকারে থাকত, তাহলে এইসব কল-কারখানা থেকে যে লাভ আসত, তা থেকেই সরকারের সব খরচ মেটান সম্ভব হত এবং আলাদা ভাবে কর বসানোর প্রশ্ন ততটা জরুরী হত না। যেটুকু কর আদায়ের প্রয়োজন হত তা সহজেই

মেটান যেত। কারণ সবাই তখন সরকারী চাকুরিজীবী হত। সরকারী চাকুরিজীবীদের পক্ষে কর ফাঁকি দেওয়া খুব সহজ নয়। সুতরাং, প্রধানতঃ সমাজের স্তর-বিভেদ ও খিচুড়ি উৎপাদন-কাঠামোই আমাদের দেশের মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী।

ভারতবর্ষে মুদ্রাস্ফীতির আর একটা কারণ 'ঘাটতি প্রথা' (deficit finance)। এই প্রথা অনুযায়ী সরকার টাকা ছাপিয়ে কল-কারখানা তৈরির কাজে লাগাত এই বিশ্বাসে যে, টাকা বাজারে ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্র কলে তৈরি হয়ে বাজারে পৌছবে; টাকার সংখ্যা বাড়লেও জিনিসপত্রের পরিমাণও বাড়বে; কাজেই দাম বাড়বে না। এই মতবাদ যে ভ্রান্ত তা অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে। এই মতবাদে বিশ্বাস করে প্রথম প্রথম প্রচুর টাকা ছাড়া হয়েছিল। ফলে জিনিসপত্র তৈরি বাড়ল বটে কিন্তু বেশ কিছুটা দেরিতে। কল-কারখানা তৈরি হতেও বেশ কিছুটা সময় লাগল। কল-কারখানা তৈরি যখন আরম্ভ হল ততদিনে সব জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছে। কাজেই এই সব কল-কারখানা শেষ করতে যা বরাদ্দ ছিল তার থেকে অনেক বেশী খরচ করতে হল, ফলে মুদ্রাস্ফীতি আরও বেড়ে গেল।

এই ঘাটতি-পন্থার মতবাদ আমাদের অর্থনীতির পণ্ডিতেরা ও সরকারী কর্মচারীরা আমাদের দেশে চালাবার যে চেষ্টা করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়ে যায়। কেন না আমাদের সমাজে জাতিভেদ ও স্তর বিভাগ এত গুরুতর যে, বিলাতের সমাজের পক্ষে প্রযোজ্য অর্থনীতির বেশীর ভাগ মতবাদই সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। এই পন্থা বা উন্নয়ন-কৌশল যে শুধু বিলাতের শিক্ষার জন্যই আমাদের দেশের সরকারী কর্মচারীরা আগ্রহের সঙ্গে নিয়েছিল তা নয়। এদের শ্রেণী-সুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে এরা উন্নয়নের জন্যে যে ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট করতে হয় তার সবটা শ্রমিক ও গরীব চাষীর উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের শ্রেণীকে শুধু লাভের অংশটাই দিতে চেয়েছিল। কারণ, মুদ্রাস্ফীতির

দ্বারা উন্নয়ন করতে যাওয়া মানেই উন্নয়নের সমস্ত ভার গরীব মজুর-চাষী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর চাপান। মুদ্রাস্ফীতি হলে পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী ও সম্পত্তিওয়ালা লোকদের খুব লাভ হয়। এক টাকার জিনিস দুটাকায় বিক্রী হয় বলে জিনিসের যত দাম বাড়ে তত বেশী লাভ করতে পারে তারা। কিন্তু মজুর, গরীব চাষী ও গরীব চাকুরীজীবীদের কিনে খেতে হয়; মুদ্রাস্ফীতি হলে তাদের আসল আয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমে যেতে থাকে সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি মানেই হল কৌশল করে গরীবের কাছ থেকে তাদের আয়ের একটা অংশ নিয়ে গিয়ে পুঁজিপতিদের দিয়ে দেওয়া।

মুদ্রাস্ফীতির বন্ধের কৌশল

মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে যখন গরীব শ্রেণী বেশী আপত্তি ও আন্দোলন করতে থাকে তখন মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করার জন্য সরকারী উচ্চস্তরের কর্মচারীরা ও উঁচু শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা নানারকমের কর্মসূচী নিয়ে থাকেন। তার বেশীর ভাগের ফল একই দাঁড়ায়—মুদ্রাস্ফীতি বন্ধের ভারটা গিয়ে পড়ে গরীব শ্রমিক, চাষী ও চাকুরিজীবীদের উপর, তাঁদের নিজেদের শ্রেণীর লাভটা পুরোপুরি বজায় থাকে। ভারতবর্ষে মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ আমরা দেখেছি,—সরকারী অত্যধিক ব্যয় ও বাজে কাজে ব্যয়, আয়ের হ্রাস ও ব্যবসায়ীদের জিনিসপত্র বিশেষ করে খাদ্যশস্য মজুত। উঁচুশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা ও নেতারা কিন্তু একথা স্বীকার করেন না;—তাঁরা বলেন, মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ মজুর ও চাকুরিজীবীদের বেতন বৃদ্ধি। তাঁদের মতে এদের বেতনবৃদ্ধি বন্ধ করতে পারলেই বাজারে টাকা কমে যাবে এবং মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ হয়ে যাবে। তাই মুদ্রাস্ফীতি বন্ধের প্রশ্ন উঠলেই তাঁরা সবচেয়ে আগে মজুর ও চাকুরিজীবীদের বেতনের উপর হানা দেন। আসল কথা, জিনিসপত্রের বিশেষ করে খাদ্যশস্যের দাম বাড়লেই

শ্রমিক ও চাকুরিজীবীরা বেতন বৃদ্ধির দাবী তোলে। তাই খাদ্যশস্যের দাম আটকানোই মুদ্রাস্ফীতি বন্ধের সবচেয়ে বড়ো ও প্রধান উপায়। খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ করতে হলে মজুতদার ও পুঁজিপতিদের শায়েস্তা করতে হয়—নির্দিষ্ট দামে খাদ্যশস্য কিনে সরকারী গুদামে মজুত করতে হয়। যাতে অনাবৃষ্টির বছর ফসল কম উৎপাদন হলেও লোকের খাদ্যের অভাব না হয় এবং শহরে ও গ্রামের গরীবদের জন্য পরিমিত হারে খাদ্যশস্য বণ্টনের ব্যবস্থা রাখা যায়। খাদ্যশস্যের দাম ঠিক রাখতে পারলে মজুর ও চাকুরিজীবীদের বেতন বৃদ্ধির প্রয়োজন হয় না। তা না করে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা ও নেতারা শ্রমিক ও চাকুরিজীবী গরীবের উপর সব বোঝা চাপাবার চেষ্টা করে থাকেন স্বভাবতঃই তাদের শ্রেণী-স্বার্থের তাগিদে।

খিচুড়ি-পন্থায় উৎপাদন করতে গেলে মুদ্রাস্ফীতি ছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধির গতি বজায় রাখা সম্ভব হয় না। পুঁজিপতিদের লাভ বজায় রাখতে গেলে ক্রমেই জিনিসপত্রের দাম বাড়ান চাই, তা না হলে তাদের লোকসান হয়। যতই জিনিসপত্রের দাম বাড়ে ততই সরকারকে বিভিন্ন কাজের জন্য বেশী টাকা খরচ করতে হয় এবং ততই জিনিস-পত্রের দাম আরও বাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিপতিদের মুনাফাও বাড়ে। অন্যদিকে এই দাম বাড়ার ফলে দরিদ্র জনসাধারণের সর্বনাশ হয়। মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করতে গেলেই ব্যবসা-সংকট দেখা দেয়; পুঁজিপতিদের লোকসান হতে থাকে এবং তারা কারখানা বন্ধ করে দেয় ও মজুর ছাটাই করে। দেশে বেকারের সংখ্যা বেড়ে যায়। খিচুড়ি পন্থায় এই উভয় সংকট থেকে উদ্ধার পাবার কোন উপায় থাকে না। পর্যায়ক্রমে মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যবসা-সংকট এই কারণেই ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে দ্রুত ফাটল ধরিয়ে দিচ্ছে।

পাঁচ

দারিদ্র্যের বৃদ্ধি ও সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য

মিশ্র পন্থার চতুর্থ কুফল হল জনসাধারণের দারিদ্র্য বৃদ্ধি। আমরা আগে আলোচনা করেছি যে, ভারতবর্ষের সমাজ বহু প্রাচীন কাল থেকেই জাতি ও শ্রেণীতে স্তরে স্তরে ভাগ করা ছিল। ইংরেজদের আমলে এই স্তর-বিভাগ আরও জোরদার হয় এবং উঁচু শ্রেণীর লোকেরা শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে নীচু শ্রেণীর লোকদের দারিদ্র্য বাড়িয়ে দেয়। স্বাধীনতার পর মিশ্র অর্থনীতি চালু হওয়াতে উঁচু শ্রেণীর লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্য ও কল-কারখানা গড়ার সুবিধা পেল প্রচুর। সরকারী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে দেশে নানা রকম শিল্পজাত জিনিসপত্রের চাহিদা বেড়ে গেল। যাদের হাতে পয়সা ছিল তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে এবং কল-কারখানা তৈরি করে প্রচুর লাভ করতে লাগল। অন্যদিকে দরিদ্র চাষীমজুর ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী মুদ্রাস্ফীতির জন্য ও সুদখোর মহাজন জোতদার ও ব্যবসায়ীদের শোষণের ফলে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়তে লাগল। চাষীরা জমিজমা খুইয়ে দলে দলে কাজের খোঁজে শহরে এসে আস্তানা গাড়ল। বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও অন্যান্য শহরগুলোর লোকসংখ্যা কয়েক বছরের ভেতর তিনগুণ চারগুণ হয়ে গেল। শহরের আশেপাশে নোংরা বস্তি গড়ে উঠল এবং এইসব বস্তিতে দরিদ্র জনসাধারণ পশুর মত জীবন যাপন করতে লাগল, একদিকে যেমন ধনীদের বড় বড় প্রাসাদোপম বাড়ী উঠতে লাগল, তেমনি আবার বস্তির নোংরা ছাপরাগুলো শহরের সীমান্ত ছেয়ে ফেলল। মুষ্টিমেয় লোক ধনী হয়ে উঠল আর বেশীর ভাগ লোক গরীব থেকে আরও গরীব হয়ে যেতে থাকল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে দেশ স্বাধীন হবার ২১ বছর পরে দেখা গেল

দেশের শতকরা ৫৪ জন লোক দারিদ্র্যের সবচেয়ে নীচু সীমারেখার থেকেও নীচে চলে গেছে। স্তর-বিভক্ত সমাজে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে উৎপাদন চললে তার একমাত্র পরিণতি হয়—বেশীর ভাগ লোকের দারিদ্র্যের বৃদ্ধি আর সমস্ত ধন-সম্পত্তি উঁচু শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোকের হাতে গিয়ে জড় হওয়া। এইরকম প্রতিযোগিতায় নীচুশ্রেণীর পরাজয় সুনিশ্চিত। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে দেশের ধন-সম্পদ প্রচুর বেড়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু তা গিয়ে জড় হয়েছে মুষ্টিমেয় ধনীগোষ্ঠীর হাতে। যারা নীচুতে ছিল তারা আরও নীচুতে চলে গেছে। এইভাবে দরিদ্র জনসাধারণকে আরও দরিদ্র করে দেওয়া হল উৎপাদন-কাঠামোর একটা বড় অংশকে ধনী শ্রেণীর হাতে ছেড়ে দেওয়ার ফল।

বেকার বৃদ্ধি

মিশ্র পন্থার পঞ্চম কুফল হল বেকার বৃদ্ধি। আমরা আগে দেখেছি, ইংরেজের আমল থেকেই আমাদের দেশের গ্রামের উৎপাদন কাঠামো ভেঙ্গে গেছে। বিলাতের কারখানা থেকে শিল্পজাত জিনিসপত্রের আমদানির ফলে আমাদের গ্রামের শিল্পগুলি নষ্ট হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের জমিদার, জোতদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের শোষণের ফলে চাষীদের দুর্দশার আরম্ভ হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর দেশের শাসন-ক্ষমতা বুর্জোয়া-শ্রেণী করতলগত করল। কিন্তু এরা সংখ্যায় যেমন কম তেমন টাকার জোরও এদের এত ছিল না যে, এরা সর্বেসর্বা হয়ে দেশ শাসন করতে পারে। কাজেই এদের গ্রামের শোষণকারী শ্রেণীগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে শাসন চালাতে হয়। এই কারণে এরা জমিদার, জোতদার, সুদখোর মহাজনদের উচ্ছেদ ক'রে ও জমি ছোট ছোট চাষীদের মধ্যে বণ্টন ক'রে দেশের কৃষিপ্রথার আমূল পরিবর্তন করতে চাইল না।

ফলে, গ্রামে শোষণ সমানভাবেই চলতে থাকল এবং চাষীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে পড়তে লাগল। একদিকে শহরে কল-কারখানা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তাতে কুটীর-শিল্পগুলির অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। ছোট চাষীদের অবস্থা খারাপ হওয়ায় ও কুটীর-শিল্পগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গ্রামের গরীব লোকদের জীবন ধারণ করা ক্রমেই কষ্টকর হয়ে উঠল। তারা ধীরে ধীরে জমি-জমা খুইয়ে বেকার হয়ে যেতে থাকল এবং চাকরির খোঁজে শহরে এসে হাজির হতে লাগল। এইভাবে শহরে এবং গ্রামে বেকারের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। কিছু কিছু লোক শহরের কল-কারখানায় কাজ পেল বটে কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম। বেশীর ভাগ লোকই বেকার থাকল এবং ফেরিওয়ালার কাজ ক'রে, কেউ ছোট দোকান দিয়ে, কেউ দিন মজুরের কাজ ক'রে, রিক্সা টেনে অথবা ভিক্ষা ক'রে কোনোমতে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে লাগল। এর উপর ভারতবর্ষের জনসংখ্যাও দিন দিন বেড়ে যাওয়াতে বেকার সংখ্যাও বেড়ে যেতে লাগল।

বেকার সংখ্যা যে শুধুমাত্র গরীব নিম্নশ্রেণীর লোকদের ভেতর বৃদ্ধি পেল তা নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের ভেতরও বেড়ে যেতে লাগল। আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথা চালু থাকার দরুণ বহু প্রাচীন কাল থেকেই শারীরিক পরিশ্রমের কাজ থেকে কাগজ-কলমের কাজকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হত। সেই অনুযায়ী লেখা পড়ার কাজে বেতনও অনেক বেশী পাওয়া যেত এবং লেখাপড়া শেখার সুবিধাগুলো উঁচু শ্রেণীর হাতেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। ইংরেজরা এদেশে এসে সস্তায় কেরাণী তৈরী করার জন্য স্কুল ও কলেজ খুলে দিল এবং উঁচু শ্রেণীর লোকেরা এইসব স্কুল কলেজে ইংরেজি শিখে নিয়ে খুব অল্প পরিশ্রমে বেশ ভাল আয় করতে পারল। তাদের দেখাদেখি অবস্থাপন্ন চাষী, মহাজন, জোতদাররা তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে চাকুরিতে

ঢোকাবার চেষ্টা করতে থাকল। চাষবাস করে কিংবা শহরে কল-কারখানায় কাজ করে যে আয় করা যায় একটু লেখাপড়া শিখে চাকুরি ক'রে তার থেকে অনেক বেশী আয় করা যেত বলে বাপ-মারা আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে যাতে তাদের ছেলেপুলেরা স্কুল কলেজে ভর্তি হয়ে দু-একটা ডিগ্রী পায়। ফলে, দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই দাবী উঠে শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার। আমাদের দেশের বুর্জোয়া শাসকেরাও দেখল যে লেখাপড়াজানা কেরাণী কর্মচারী যত বেশী থাকবে তত কম টাকা দিয়ে তাদেব কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেওয়া যাবে। কাজেই এই ধরণেব কেরাণী তৈরির জন্য শিক্ষা-বিস্তারের পরিণাম জেনেও তারা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে কুণ্ঠিত হল না। এর ফল দাঁড়াল এই যে, প্রতি বছর হাজার হাজার লোক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে বেরুচ্ছে কিন্তু চাকুরি আর তাদের জুটছে না। তাদের জীবনে অপরের গলগ্রহ হয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকছে না।

পুঁজিপতিরা বেকারী সৃষ্টি করে মজুর আর কেরাণীদের কম বেতন দিয়ে খাটিয়ে নেবার জন্য। কিন্তু এর ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারে। কারণ, এই বেকারীর বোঝা বইতে গিয়ে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র চাষী-মজুর শ্রেণী আরও গরীব হয়ে পড়ে। ফলে তাদের জিনিসপত্র কেনবার ক্ষমতা আরও কমে যায় এবং পুঁজিপতিদের বাজার আরও ছোট হয়ে আসে। লোকের দারিদ্র্য বাড়িয়ে দিয়ে, বাজার সংকীর্ণ করে দিয়ে তারা নিজেরাই তাদের নিজেদের সংকট ডেকে আনে।

ছয়

আন্তর্জাতিক কম্পানি ও সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য বিস্তার

মিশ্র পন্থার ছয় নম্বর কুফল হল ভারতের উৎপাদন ব্যবস্থার উপর বিদেশী আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলির ও সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রভুত্ব বিস্তার।

বিদেশী পুঁজিপতিরা তাদের দেশের ভেতরে বাজারের অভাবে ক্রমেই সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। নানারকম কলকব্জা ও উন্নত ধরনের উৎপাদনের উপায় আবিষ্কার করার ফলে তাদের উৎপাদনের ক্ষমতা খুব বেড়ে গেছে কিন্তু তাদের দেশেও জনসাধারণের আয় সেই পরিমাণে না বাড়ায় তাদের সেই সব পণ্য কেনবার ক্ষমতা যথেষ্ট বাড়ছে না। কাজেই তারা বিদেশের বাজারের খোঁজে বেরোচ্ছে। এছাড়াও কাঁচামালের খোঁজে তারা বরাবরই অনুন্নত দেশগুলিকে নিজেদের হাতে রাখার চেষ্টা করে আসছিল সাম্রাজ্যবাদী আমল থেকেই। এই দুই উদ্দেশ্যে তারা অনুন্নত দেশগুলোর পুঁজিবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এইসব দেশে তাদের পুঁজি খাটাবার সুযোগ খুঁজে আসছিল। অনুন্নত দেশগুলি স্বাধীন হবার আগে সম্পূর্ণ বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে ছিল। স্বাধীন হবার পর বিদেশী পুঁজিপতিরা আর খোলাখুলি ভাবে এইসব সম্পদ হরণ ও গরীব জনসাধারণকে শোষণ করতে পারল না, তাই ভাগাভাগি করে দেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে যুক্ত কম্পানি খাড়া করে শোষণ চালাতে লাগল।

বিদেশী কম্পানিগুলোর কলকব্জা ও উৎপাদনের কলা-কৌশল সম্বন্ধে বেশী দক্ষতা থাকায় এবং টাকার জোরও বেশী থাকায় এইসব যুক্ত কম্পানিগুলোতে তাদের প্রাধান্য অনেক বেশী থাকে। বস্তুতঃ তাদের পুঁজির পরিমাণ দেশী পুঁজিপতিদের আনুপাতিক

পরিমাণের থেকে কম থাকলেও তারাই এই কম্পানিগুলোর আসল কর্ণধার হয়ে থাকে। ফলে তারা এদেশ থেকে লাভ হিসাবে এবং অন্যান্য নানা উপায়ে প্রচুর টাকা বিদেশে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। যেমন, যন্ত্রপাতি যা তারা তাদের নিজেদের বিলাতের কম্পানির কাছ থেকে কেনে তার দাম বাজারের দামের থেকে অনেক বেশী করে ধরে দেয়। তেমনি আবার যে সব জিনিস তাদের বিলাতের কম্পানির কাছে তারা বিক্রি করে তার দাম খুব সস্তা করে দেয়। আমদানি যন্ত্রপাতির দাম বেশী করে দিয়ে ও রপ্তানি পণ্যের বিক্রী-দাম কম করে নিয়ে তারা হিসাবের খাতায় লোকসান বা কম লাভ দেখায় এবং সেই অনুযায়ী কর ও অন্যান্য শুল্কও কম দিয়ে থাকে। তাদের বিলাতের হেড-অফিসের কাছ থেকে উঁচু হারে টাকা ধার করে কিংবা খুব কম সুদে টাকা ধার দেয়। যদি কোনো বিশেষজ্ঞের উপদেশ দরকার হয় তবে বিলাতের হেড অফিস থেকে লোক আসে এবং খুব উচ্চ হারে তাকে ফি দেওয়া হয়। এইভাবে তারা দেশী পুঁজিপতিদের শিখণ্ডী খাড়া করে আড়াল থেকে দেশের সম্পদ শোষণ করতে থাকে। দেশী পুঁজিপতিরা অবশ্য এই শোষণের একটা অংশ পায়। এইভাবে দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতিদের এক যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠে। দেশের স্বাধীনতার পক্ষে এই যুক্তফ্রন্ট একটা গুরুতর শত্রু হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং কঠিন সংকটকালে এরা দেশের সরকার দখল পর্যন্ত করে নিতে পারে। এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে—চিলি, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন ইত্যাদি দেশগুলোতে এই রকম দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতি-দের গোপন যুক্তফ্রন্ট দেশের স্বাধীনতাকামী সরকারের উচ্ছেদ সাধন করে ক্ষমতা দখল করে নিতে সমর্থ হয়েছিল; সে সব ঘটনা খুব বেশী দিনেরও নয়। ভারতবর্ষে যদি বিদেশী ও দেশী পুঁজিপতিদের যুক্ত কম্পানি বেশী খুলতে দেওয়া হয় তাহলে ভারতবর্ষকেও ভবিষ্যতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এইসব কম্পানিগুলোর দেশী শিখণ্ডীদের আড়ালে থেকে আবার পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ করতে পারে।

আমাদের দেশের পুঁজিপতিদের সংকট যতই বাড়ছে ততই তারা তাদের লাভের অংশটা বজায় রাখবার জন্য বিদেশী পুঁজিপতিদের আহ্বান জানাচ্ছে—এদেশে এসে উন্নততর প্রথায় ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে। বিদেশী পুঁজিপতিরা যদি দেশী পুঁজিপতিদের সহায়তায় এদেশে একবার গেড়ে বসতে পারে, তাহলে তাদের আর উঠানো যাবে না, বরং ছুঁচ হয়ে ঢুকে তারা ফাল হয়ে বেরুবে। টাকার জোরে তারা অনেক দেশী কম্পানির উপর সহজেই কর্তৃত্ব বিস্তার করে ফেলবে। এমন কি তাদের দেশের গুপ্তচর বিভাগের সাহায্যে প্রচুর টাকা খরচ করে এদেশে এমন একটা অরাজকতার সৃষ্টি করবে যার সুযোগ নিয়ে এরা এদের সমর্থকদের শাসন-গদিতে পর্যন্ত বসাতে পারে। এই করতে গিয়ে এদের বিরুদ্ধে যারা থাকে তাদের গুপ্তভাবে হত্যা করতেও এরা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। রাজনৈতিক নেতা, মিলিটারীর কিছু কিছু লোকদের এবং পশ্চিম-ঘেঁষা সরকারী কর্মচারীদেরও এরা সহজেই কিনে ফেলতে পারে। দেশে অরাজকতা চলছে, দুর্নীতি বাড়ছে, শাসন-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, উৎপাদন কমছে, লোকের দুঃখকষ্ট বাড়ছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে এই সব কারণ দেখিয়ে অনেক ভাল ভাল লোক ও রাজনৈতিক নেতাদেরও এরা দলে টেনে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। একবার ক্ষমতা দখল করতে পারলে অবশ্য এরা সহযোগী দেশী পুঁজিপতি ও শোষণকারী মহাজন মালিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নির্বিঘ্নে দরিদ্র জনসাধারণকে বিনা দ্বিধায় ও বিনা বাধায় শোষণ করে যেতে পারে।

আমেরিকার "এনাকোনডা" নামে একটা তামা তৈরির কম্পানি ও "ইন্টারন্যাশন্যাল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন কম্পানি" আমেরিকার গুপ্তচর বিভাগের সাহায্যে এইভাবে চিলির প্রেসিডেন্ট আলাণ্ডেকে হত্যা করে এবং কয়েকজন মিলিটারী লোকের সাহায্যে ঐদেশে তাদের একাধিপত্য স্থাপন করে। ফিলিপিনে, ইন্দোনেশিয়ায় এবং

কিছুদিন আগে বাংলাদেশেও এরা এইভাবে দেশের শাসন-গদিতে নিজেদের বংশবদ লোক বসিয়ে দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে যথেচ্ছ শোষণ করার সুবিধা করে নিয়েছে। ভারতবর্ষে সাময়িকভাবে যদিও এই চক্রান্ত বিফল হয়েছে, তথাপি আমাদের দেশে এবং বেশীর ভাগ অনুন্নত দেশগুলিতে বিদেশী দালালদের প্রাদুর্ভাব বিন্দুমাত্র কমেনি। এবং এইসব দেশের শাসন-গদি দখল করার চক্রান্তেরও শেষ হয়নি। শুধু ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি শ্রেণীরাই নয়, অনেকে রাজনৈতিক নেতা, মিলিটারী নেতা এমন কি মন্ত্রীদের মধ্যেও অনেক বিদেশী কম্পানির দালালী করতে কুণ্ঠিত হয় না। দেশের অধিকাংশ খববের কাগজগুলোও বিদেশী কম্পানিগুলোর দালালী করতে লজ্জাবোধ করে না।

বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে আমাদের দেশীয় পুঁজিপতিদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হ'লে শুধু যে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ, চাষী, মজুর, মধ্যবিত্তের উপর শোষণচাপ বেড়ে যাবে ও দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে তাই নয়, সমাজের নৈতিক অধঃপতনও ঘটবে। কারণ পশ্চিম দেশীয় ভোগী জীবনের অমিতচার দেশীয় পুঁজিপতিরা ও এই যুক্ত কম্পানিব কর্মচারীরা সহজেই শিখে দেশের নৈতিক চেতনা নষ্ট করে ফেলে। ফলে মদ্যপান ও অন্যান্য অসংযম অসম্ভব বেড়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। বিলাসিতার আকর্ষণ উগ্র থেকে উগ্রতর হয়। ঘুষ ও অসৎ উপায়ে টাকা রোজগারের নেশা সমস্ত জাতিকে পেয়ে। পাশ্চাত্য সভ্যতার গুণগুলো না নিয়ে দোষগুলো সংক্রামক ব্যাধির মত দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সমাজের এই নৈতিক অবনতি পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী ফল। বিদেশী পুঁজিবাদের সহযোগিতায় এই সংক্রামক ব্যাধি আরও দ্রুত ছড়ায়। বিদেশী আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলো কিভাবে দেশের স্বাধীনতা নষ্ট ক'রে অনুন্নত দেশগুলিকে শোষণ করে তার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে আমেরিকার আইন-সভার তদন্তে। দেখা গেছে, আমেরিকার বড় বড়

কম্পানিগুলো অনুন্নত দেশগুলোতে ব্যবসায়ের অধিকার ও নানারকম সুবিধা পাবার জন্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতাদের এবং মন্ত্রীদের প্রচুর টাকা ঘুষ দিয়ে থাকে এবং তাদের আত্মীয় স্বজনদের মোটা বেতনে তাদের কম্পানিতে চাকুরি দিয়ে হাত করে রাখে। আমেরিকার গুপ্তচর বিভাগও এইসব কম্পানিগুলোর সাহায্যের জন্য প্রচুর টাকা খরচ করে। বিশেষ করে এরা চেষ্টা করে উপবিষ্ট সেনাপতিদের ও সরকারী কর্মচারীদের হাত করতে। পূর্বেই বলেছি, রাজনৈতিক নেতাদেরও এরা হাত করার চেষ্টা করে। এমন কি, বামপন্থী দলের নেতাদেরও এরা অনেক সময় হাত করে ফেলে এবং উগ্র বামপন্থী মতবাদ ছড়িয়ে বামপন্থী দলগুলোর ভেতর দলাদলির সৃষ্টি ক'রে তাদের সংগঠন দুর্বল করে ফেলে। খবর-কাগজগুলোর উপরও এদের বিশেষ নজর থাকে। খবরকাগজগুলো সাধারণতঃ পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই এরা প্রচার-কার্য চালায়। কাজেই সামান্য কিছু খরচ করলেই বিদেশী কম্পানিগুলো ও আমেরিকার গুপ্তচর বিভাগ এদের নিজেদের কাজে লাগাতে পারে।

বিদেশী কম্পানিগুলি অবশ্য প্রকাশ্যে অনুন্নত দেশগুলিকে শোষণ করতে এবং তাদের উপর প্রভুত্ব করবে বলে আসে না। তারা আসে পরম হিতৈষী বন্ধুর মুখোশ পরে। তাদের পুঁজি অনেক, তাদের উন্নত ধরনের কলকব্জা অনেক, উৎপাদন-সংক্রান্ত কলা-কৌশল-জ্ঞানও তাদের অনেক অনেক বেশী আয়ত্ত; অনুন্নত দেশগুলোর এ সব কটিরই অভাব। তাদের না আছে পুঁজি, না আছে শিল্প-বিদ্যায় যথেষ্ট জ্ঞান। কলকব্জা কেনবার মত পয়সাও তাদের নেই। কাজেই বিদেশী কম্পানিগুলো যখন এইসব নিয়ে কারখানা খুলবার প্রস্তাব করে তখন দেশে বিনা কষ্টে শিল্পের প্রসার হবে ভেবে অনুন্নত দেশের কর্মকর্তারা তাদের ফাঁদে পা বাড়ায়। কিন্তু একবার তাঁদের ফাঁদে পা দিলে আর রক্ষা থাকে না। ধীরে ধীরে এরা এদের

শিকড় চারিদিকে ছড়িয়ে ফেলে এবং বছর বছর মোটা টাকা মুনাফা হিসাবে ও অন্যান্য প্রাপ্য হিসাবে দেশ থেকে বার করে নিতে থাকে। হিসাব করে দেখা গেছে, ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৩ সালের ভেতর আমেরিকার এই আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলো অনুন্নত দেশগুলোতে মোট ৯১০ কোটী ডলার পুঁজি হিসাবে পাঠিয়েছে, আর ১,৯৪০ কোটী ডলার লাভ হিসাবে এই সব দেশ থেকে আদায় করেছে। ইউরোপ ও জাপানে আমেরিকার আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলো যে হারে লাভ করেছে অনুন্নত দেশগুলো থেকে তার তিনগুণ বেশী হারে তারা লাভ আদায় করেছে।

আমাদের দেশেও বিদেশী আন্তর্জাতিক কম্পানির সঙ্গে দেশী পুঁজিপতিদের যুক্ত কম্পানিগুলো সবচেয়ে বেশী হারে লাভ করে। রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাব থেকে দেখা যায়, ৫১৬টা বিদেশীর দ্বারা চালিত যুক্ত কোম্পানি ১৯৭১-৭২ সালে তাদের মোট বিক্রীর তুলনায় শতকরা ১৩ টাকা ২০ পয়সা হারে লাভ করে। ২৩০০টা সম্পূর্ণ দেশী কম্পানি এই বছরই মাত্র শতকরা ৮ টাকা ১০ পয়সা হারে লাভ করে। পুরোপুরি আন্তর্জাতিক কম্পানির শাখাগুলো মাত্র ৫ টাকা ৩০ পয়সা হিসাবে লাভ করে। অবশ্য এই আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলোর সব সময়ই রাজস্ব যাতে কম দিতে হয়, তার জন্য তাদের হেড অফিস থেকে বেশী দামে জিনিসপত্র কিনে ও অন্যান্য ভাবে খরচা বেশী দেখিয়ে লাভ কম দেখায়। সাধারণতঃ কলকব্জা ও জিনিসপত্রের জন্য আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলো এত বেশী দাম ধরে দেয় যে কয়েক বছরের ভেতরেই তাদের সব পুঁজি উঠে আসে এবং তারপর থেকে তাদের যা আয় হয় তার সবটাই তাদের লাভ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং শতকরা ৫ টাকা হারে লাভ দেখালেও আসল লাভ তাদের অনেক বেশী।

যুক্ত কম্পানিগুলোর লাভ বেশী হয় বলে আমাদের দেশের পুঁজিপতিরা বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুক্ত কম্পানি

খোলার জন্য এত আগ্রহান্বিত হয়। এই কম্পানিগুলো যে দেশের উৎপাদন কাঠামোকে বিদেশীদের হাতে বিকিয়ে দিচ্ছে এবং দেশের সম্পদের একটা মোটা অংশ বিদেশে চালান করে দিচ্ছে তাতে তাদের মোটেই আপত্তি বা উদ্বেগ নেই। তারা দেশের জন্য বিশেষ কিছু মাথা না ঘামিয়ে উচ্চ হারে লাভের একটা অংশ পাচ্ছে বলেই খুশী থাকে। এইভাবে শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে আমাদের দেশের পুঁজিপতিরা দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে কুণ্ঠা বোধ করছে না। এরা আমাদের দেশের স্বাধীনতার বিপদ ডেকে আনতে পারছে, কারণ আমাদের দেশ কারখানা-শিল্পে এখনও পেছনে পড়ে রয়েছে। আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলোর উন্নত ধরনের উৎপাদনপ্রথা সম্বন্ধে নানা ধরনের কলাকৌশল জানতে পারলে আমাদের দেশের শিল্পের দ্রুত উন্নতি হত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু খিচুড়ি-পন্থা অনুযায়ী ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলোকে ব্যবসা করতে দিলে তাতে দেশের স্বাধীনতা হারাবার সম্ভাবনা থাকে, দেশের সম্পদ বিদেশে চালান হয়ে যায় এবং দেশের জনসাধারণের দারিদ্র্য আরও বাড়ে।

ভারতবর্ষে বিদেশীদের সঙ্গে লেনদেনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, তিন উপায়ে এইসব বিপদগুলো বাঁচিয়ে উন্নত প্রথায় শিল্পের কলা-কৌশল আয়ত্ত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ বিদেশী কম্পানি-গুলি যদি ব্যক্তিগত শিল্পপতিদের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে সরকারী কম্পানিগুলোর সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ের ও উৎপাদনের সংস্থা স্থাপন করে, তাহলে দেশের স্বাধীনতা হারাবার, দারিদ্র্য-বৃদ্ধির ও বিদেশীদের অনুচিত হারে দেশ থেকে সম্পদ শোষণের সম্ভাবনা কমে যায়। উদাহারণ স্বরূপ হিন্দুস্থান ঘড়ি উৎপাদনের কারখানার কথা ধরা যেতে পারে। খিচুড়ি-পন্থা অনুযায়ী ভারত সরকার ব্যক্তিগতভাবে দেশের পুঁজিপতিদের বহু সাধ্য-সাধনা করল ঘড়ি তৈরির কারখানা খুলতে। তারা কিছুতেই রাজী হল না লাভ বেশী হবে না বলে।

তখন একটা সরকারী কম্পানি খুলে বিদেশী কম্পানির সঙ্গে ব্যবস্থা করে ঘড়ি তৈরির কারখানা স্থাপন করা হল। দেখতে দেখতে এ কারখানা শুধু যে দেশের ঘড়ির চাহিদা মেটাচ্ছে তা নয়, বিদেশেও অনেক ঘড়ি রপ্তানি করছে।

দ্বিতীয় পথ হল বিদেশী কম্পানিগুলির সঙ্গে কলকারখানা ও ব্যবসায়িক চুক্তি না করে শুধু তাদের কলা-কৌশল ও উৎপাদন-পদ্ধতি কিনে নেওয়া। আমাদের দেশে আজকাল নিপুণ ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিকদের অভাব নেই। দেশের অনেক মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার ও বৈজ্ঞানিক বিদেশে চলে যাচ্ছে উপযুক্ত সুযোগের অভাবে। বিদেশী কম্পানির কাছ থেকে উৎপাদন কৌশলের বিবরণ কিনে এই সব মেধাবী ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্যে কারখানা স্থাপন করে উৎপাদন চালু করলে বিদেশীদের শোষণের ও শাসনের সম্ভাবনা কম থাকে। অবশ্য প্রথম প্রথম এইসব কারখানাগুলো চালু করতে বেশ কিছু বেগ পেতে হয় এবং লোকসানের সম্ভাবনাও বেশী থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের ইঞ্জিনিয়াররা ও বৈজ্ঞানিকেরা নিজেরাই যথেষ্ট উৎসাহ পেলে এবং পুঁজিপতি ও সরকারী বড় কর্তাদের হম্বিতম্বির জন্য নিরুৎসাহ হয়ে না পড়লে, শীঘ্র শীঘ্রই এই কারখানাগুলোকে যথেষ্ট শক্তিশালী করে ফেলতে পারবে। নিজেরাই অনেক নূতন নূতন কলা-কৌশল আবিষ্কার করে ফেলতে পারবে যাতে করে কারখানাগুলোর উৎপাদনক্ষমতা অনেক বেড়ে যাবে।

তৃতীয় উপায় হল সমাজবাদী দেশগুলোর সঙ্গে চুক্তি করে কল-কারখানা স্থাপন করা। সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলোর সহযোগে আমাদের দেশে যে সব কল-কারখানা চালু হয়েছে সেগুলো শুধু যে ভালভাবে চলেছে তাই নয়, তার খরচও খুব কম হয়েছে এবং অতি অল্প টাকাই বিদেশে চলে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলো যেমন আমেরিকার গুপ্তচর বিভাগের সাহায্যে দেশীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে যোগ দিয়ে

দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন করে ফেলে, সমাজবাদী দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের ও কল-কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা করলে সে রকম কোনো বিপদের আশঙ্কা থাকে না। সমাজবাদী দেশগুলোতে যতখানি উৎপাদনের কলা-কৌশল আছে তা তারা সহজেই আমাদের দেশে চালু করে দিতে পারে। ফলে দেশের যান্ত্রিক কলা-কৌশলের জ্ঞান-ভাণ্ডার দ্রুত বৃদ্ধি পায়। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো আসে সাহায্যের নামে লোভ উঠাতে এবং অনুন্নত দেশকে তাদের সাম্রাজ্য-ভুক্ত করে পুরোপুরি শোষণ চালাতে। আর সমাজবাদী দেশগুলো আসে যেসব জিনিসপত্র তাদের দেশে পাওয়া যায় না, আমাদের দেশ থেকে সেগুলো যাতে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে। এই জিনিসগুলো কিনতে গেলে তাদের জিনিসও আমাদের কাছে কিছু বিক্রী করতে হয়। কিন্তু আমাদের ক্রয়ক্ষমতা কম, আমাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ালেই আমরা তাদের জিনিসপত্র কিনতে পারি। তাদের কলকব্জা কিনলে তারাও আমাদের তৈরি জিনিসপত্র কিনতে পারে। এই রকম উৎপাদন ও বিনিময়ের ফলে উভয় দেশেরই সুবিধা হয় এবং উভয় দেশেরই উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়। এই উদ্দেশ্য নিয়েই সমাজবাদী দেশগুলো অনুন্নত দেশের সঙ্গে বাণিজ্য-চুক্তি ও কল কারখানা স্থাপনের চুক্তি করে। এ রকম ব্যবস্থায় দেশের স্বাধীনতা হারাবার সম্ভাবনা ও শোষণের সম্ভাবনা আদৌ থাকে না।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের অনেক পুঁজিপতি রাতারাতি কোটিপতি হবার লোভে এবং উচ্চপদস্থ অনেক সরকারী কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতা বিদেশী আন্তর্জাতিক কম্পানির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের আমাদের দেশে ঢোকার অবারিত দ্বার করে দেওয়ার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এবং অনেকাংশে এরা সফলও হয়েছে। এই আন্দোলনের ফলে ভারত সরকার বিদেশী পুঁজিপতিদের অনেক সুবিধা দিতে বাধ্য হয়েছে এবং ১৯৭৫ সালের ঘোষিত

সরকারী নীতিতে বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষ বিদেশী পুঁজিপতিদের আমাদের দেশে এসে ব্যবসা করার নানা প্রকার সুবিধা দেবে। এই লাভের আশায় দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন করার এই প্রচেষ্টাকে রোধ করতে গেলে দেশের চাষী, মজুর, মধ্যবিত্ত ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শ্রেণীগুলির যুক্ত আন্দোলন দরকার। সে আন্দোলনের কলা-কৌশল আমরা এই বইয়ের শেষ ভাগে আলোচনা করব।

সাত

কৃষির উন্নতির অন্তরায়

মিশ্র পন্থার, সাত নম্বর কুফল হল কৃষির দ্রুত উন্নতির পথে বাধা। এই পন্থার ফলে গ্রামে শহরের ন্যায় ধনসম্পত্তি ও জমি অল্প সংখ্যক লোকের হাতে জমা হতে থাকে এবং বেশীর ভাগ গ্রামবাসীরা গরীব হয়ে যেতে থাকে।

আমরা দেখেছি যে, ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল থেকেই সমাজ উঁচু নীচু স্তরে ভাগ করা হয়েছিল। ইংরেজদের আমলে এই স্তর-বিভাগ আশ্রয় করে শোষণের মাত্রা আরও বর্ধিত হয়। ভারত স্বাধীন হবার পর এই স্তরভেদ ও শোষণপন্থা পরিবর্তন করা হল না বরং আরও প্রশ্রয় পেল। আমাদের দেশের গরীবি বেড়ে গেছে প্রধানতঃ ব্যক্তিগত অধিকারে উৎপাদন কাঠামোর যে অংশটা আছে তার মারফৎ। খিচুড়ি-পন্থায় দেশে ধনদৌলত বাড়াবার জন্যে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা আরও ভয়ঙ্করভাবে দেখা দিচ্ছে। এই প্রতিযোগিতার ফলে গ্রামের নীচুস্তরের লোকদের হাতে যেটুকুও সম্পদ ও জমিজমা ছিল তাও তারা হারিয়ে ফেলছে। উচ্চহারে টাকা সুদে খাটিয়ে চাষীদের সর্বস্বান্ত ক'রে তাদের জমিজমা, হাল, গরু-বদল সব দখল করে নিচ্ছে বড় চাষী, জোতদার ও মহাজনরা।

ক্ষেত খামারের কাজে সব সময়ই যথেষ্ট টাকা পয়সার দরকার হয়। বীজ, গরু, হাল কিনতে, জলসেচের ব্যবস্থা করতে এবং নানা কাজের জন্য টাকার দরকার হয়। তাছাড়া বাড়ীঘর মেরামত করতে, শ্রাদ্ধ-বিবাহ, চিকিৎসা ও আকাল পড়লে ধান চাল কিনতেও টাকা লাগে। গরীব চাষীদের নিজেদের জমা টাকা এত থাকে না যা দিয়ে এইসব খরচ নিজেরাই চালাতে পারে। কাজেই এই ধরনের প্রয়োজন পড়লে তাদের টাকা ধার করতে হয়। গ্রামের ধনী চাষী,

মহাজন, জোতদার ও ব্যবসায়ীরা চাষীদের উচ্চহারে টাকা ধার দেয়। এই সুদের হার মাসে তিন চার টাকা থেকে দশ টাকা অবধি দেখা গেছে। একবার এই উচ্চ হারে টাকা ধার করলে সারা জীবনেও তারা আর তা শোধ করতে পারে না। কারণ জমি থেকে খুব ভাল ধান হলেও এত টাকা বাড়তি কখনই হয় না যাতে তারা আসল ত দূরের কথা সুদের টাকাটাই যোগাড় করতে পারে। ফলে, কয়েক বছরের ভেতরেই তাদের জমি হাতছাড়া হয়ে যায়। তখন তারা নিজেদের জমিতেই ভাগচাষী বা মহাজনের ও বড় চাষীর দাস হয়ে কাজ ক'রে কোনো মতে জীবনধারণ করে। জোতদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীরা এইভাবে ছোট গরীব চাষীদের শোষণ করতে থাকে ও দরিদ্র চাষীরা দেনার দায়ে ক্রমেই আরও গরাব হয়ে যেতে থাকে।

নূতন চাষ-প্রণালীর ফল

গ্রামে ধনী-গবীবদের ব্যবধান আরও বেড়ে গেছে গত কয়েক বছর ধরে নূতন চাষ প্রণালী ও ফসলের তেজী বীজ আবিষ্কার হবার পর থেকে।

কৃষি বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফলে নূতন ধরনের বীজ আবিষ্কার হয়েছে, নানা প্রকার ঔষধ ও সার তৈরি হচ্ছে, যেগুলো ঠিকমত ব্যবহার করলে জমির ফসল দ্বিগুণ, তিনগুণ বাড়ান যায়। এই সব তেজী বীজ ও ঔষধ এবং নূতন ধরনের চাষ প্রণালী সম্বন্ধে ভারত সরকার কৃষি বিভাগগুলির মারফৎ চাষীদের ভেতর বেশ কিছুটা প্রচার করেছে। ফলে, অনেক জায়গায় উন্নত প্রণালীর চাষবাস চাষীরা শিখে নিয়েছে।

এই নূতন চাষ প্রণালীর প্রধান অসুবিধা হল—এতে প্রচুর টাকার প্রয়োজন হয় এবং ফসল নষ্ট হবার সম্ভাবনা পুরানো ধরনের

চাষের তুলনায় অনেক বেশী থাকে। প্রথমতঃ তেজী বীজ কিনতে ও সার ও ঔষধপত্র কিনতে টাকা লাগে। জলসেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করলে তেজী বীজ নষ্ট হয়ে যায়, জমিতে ঔষধ না ছড়ালে পোকায় গাছ খেয়ে ফেলে। গরীব চাষীদের পক্ষে এই টাকা যোগাড় করাই কষ্টকর হয়। যদি বড় চাষী, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তারা টাকা ধার করে তবে এত সুদ দিতে হয় যে ধান-চাল বিক্রী করে যে টাকা তারা পায় তার থেকে সুদের টাকা যোগানই মুস্কিল হয়ে পড়ে।

এই উন্নত ধরনের চাষের চাইতে সব বড় বাধা হল দরিদ্র চাষীদের উপর উচ্চহারে সুদের ও খাজনার এবং ব্যবসায়ীদের উচ্চ লাভের বোঝা। দুই কারণে এইসব শোষণভার উন্নত প্রথায় চাষের বাধা জন্মায়। প্রথমতঃ উন্নত প্রথায় চাষ করতে যে টাকা লাগে সে টাকা তাদের নেই এবং উচ্চ হারে সুদ দিয়ে সে টাকা যোগাড় করলে তাদের কিছুই লাভ থাকে না বরং দেনার দায় আরও বেড়ে যায়। দ্বিতীয়তঃ ধনী বড় চাষীরাও এই প্রথায় তাদের জমি চাষ করাতে চাইবে না যদি কোনো বছর শস্যের দাম পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে কিংবা তেজী বীজ, ঔষধপত্র ও পাম্প্ ও কলের দাম বেড়ে যায়। উন্নত প্রথায় চাষ ক'রে তাদের যে মুনাফা হবে সে মুনাফা যদি টাকা সুদে খাটিয়ে জমির খাজনা বা ভাগচাষের আদায় এবং জমির ফসল কেনাবেচা করে যে আয় হয় তার থেকে বেশী না হয়, তাহলে উন্নত প্রথায় শুধু দেশের লোকদের পেট ভরাবার জন্য জমিতে বেশী ফসল উৎপাদন করার কোনো উৎসাহ তাদের থাকবে না। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত ফসলের চড়া দাম থাকবে এবং সরকার ঔষধ পত্র, সার, জলসেচ ও যন্ত্রপাতির খরচা নিজেরা বহন ক'রে সস্তাদামে তা চাষীদের কাছে বিক্রী করবে, ততদিনই তারা উন্নত ধরনের চাষবাসে উৎসাহ দেখাবে। যখনই ফসলের দাম পড়ে গিয়ে বা খরচা বেড়ে গিয়ে লাভ কমে যাবে তখনই তারা উন্নত প্রথায় চাষ বন্ধ

করে দিয়ে তাদের পুঁজি মহাজনী কারবারে, ভাগচাষীর আদায়ে অথবা অন্য কেনাবেচার ব্যবসায়ে খাটাবে। কারণ, এইসব কাজে তাদের লাভ অনেক বেশী হয়। গ্রামে মহাজন ও বড় চাষীরা টাকা ধার দিয়ে প্রতিমাসে টাকায় তিন পয়সা থেকে দশ পয়সা অবধি সুদ আদায় করে। চক্রবৃদ্ধি হারে হিসাব করলে এই সুদের হার দাঁড়ায় বছরে ৪২৲ টাকা থেকে ২১৪৲ টাকা পর্যন্ত। যত উন্নত ধরনের চাষই হোক না কেন এই হারে আয় হওয়া চাষ করে কিছুতেই সম্ভব হয় না।

যে সব জায়গায় উন্নত ধরনের চাষ চালু হয়েছে, যেমন পাঞ্জাবে, সেখানে দেখা গেছে এই প্রথায় চাষ করে প্রচুর লাভ হয়েছে। পাঞ্জাবে আগে যেখানে প্রতি একরে ১৬৲ টাকা লাভ হত, উন্নত প্রথায় চাষ করে সেখানে ২০১৲ টাকা লাভ হয়েছে।[১] এই লাভের ভেতর অবশ্য শস্যের দাম বাড়া, সরকারী সাহায্যে সস্তায় বীজ, ঔষধপত্র ও সার এবং জলসেচের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির অংশও রয়েছে। তথাপি এই হারে লাভ হলে সুদের আয় থেকে চাষের আয় বেশী হয়। পাঞ্জাবের আর একটা বড় সুবিধা হচ্ছে যে সেখানে ইংরেজ আমল থেকেই সস্তায় ঋণ ও জলসেচের ভাল সরকারী ব্যবস্থা ছিল। বিশেষ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য শিখ সৈন্যদের গ্রামে যাতে কোনোরকমে চাষীদের অসন্তুষ্টি না ছড়ায় সেদিকে তারা খুবই নজর দিয়েছিল। ফলে পাঞ্জাবে সুদখোরের উৎপাত ততটা বেশী ছিল না এবং ধনী ও গরীব চাষীদের ভেতর ব্যবধানও কম ছিল। এর ফলে, উন্নত ধরনের চাষ পাঞ্জাবে যত বেশী বিস্তার লাভ করেছে এত বেশী আর কোথাও করেনি।

ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ জায়গায় গরীব চাষীদের ভাগ-চাষে

১। হনুমন্ত রাও-এর "Technological Change and Distribution of Gains in Indian Agriculture" বই-এর ১৩২ পৃষ্ঠায় এই হিসাব দেওয়া আছে।

জমি দিয়ে, টাকা লগ্নি দিয়ে এবং তাদের ফসল অগ্রিম কিনে উন্নত প্রথায় চাষের থেকে অনেক বেশী লাভ থাকে। এই কারণে উন্নত ধরনের চাষ আমাদের দেশে বেশী কার্যকরী হচ্ছে না। হনুমন্ত রাও-এর হিসাবে ১৯৭১ সাল অবধি ভারতের মোট খাদ্যশস্যের শতকরা ৫ থেকে ৬ $\frac{1}{2}$ অংশমাত্র এই উন্নত প্রথায় চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়েছে।[১]

যে সব জায়গায় উন্নত ধরনের চাষ চালু হয়েছে সেখানেও সরকার যত দিন অধিক দাম দিয়ে খাদ্যশস্য কিনবে এবং কম দামে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিক্রী করবে ততদিন পর্যন্ত উন্নত ধরনের চাষের লাভ সুদ ও ব্যবসায়ী আয়ের থেকে বেশী থাকবে এবং ততদিন পর্যন্তই ধনী চাষীরা এই উন্নত ধরনের চাষে তাদের মূলধন নিয়োগ করবে।

খিচুড়ি-পন্থা অনুসারে সম্পত্তিতে জোতদারদের, মহাজনদের অধিকার বজায় রেখে কৃষির উন্নতি করবার চেষ্টা করতে গিয়ে আজ পর্যন্ত সরকার প্রচুর টাকা খরচ করেছে। তাতে মোট ফসলের পরিমাণ কিছুটা বেড়েছে বটে, কিন্তু এই উন্নত ধরনের চাষের প্রথা বজায় রাখতে গিয়ে সরকারকে সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে। এই টাকা আদায় করতে হয়েছে উৎপাদন কাঠামোর অন্যান্য অংশ থেকে। ফলে শিল্পের প্রসার বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেজন্য অন্যান্য অংশের উপর গুরুতর করভার চাপানো হয়েছে এবং যেহেতু কর আদায় করেও এইসব খরচা মেটান যায়নি, তাই নোট ছাপিয়ে মুদ্রা-স্ফীতির সৃষ্টি করা হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে দরিদ্র জনসাধারণের উপর কঠোর চাপ পড়েছে। জনসাধারণের দারিদ্র্য বেড়ে গিয়ে শিল্পের উৎপাদিত জিনিসপত্রের চাহিদাও কমে গিয়েছে। শুধুমাত্র বিলাসিতার জিনিসগুলোর চাহিদা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। গ্রামে

১। হনুমন্ত রাওএর পূর্বোক্ত বইএর ৮ পৃষ্ঠা দেখুন

নূতন ধনী শ্রেণী তৈরী হয়েছে। তারা পাল্লা দিয়ে শহরের ধনী শ্রেণীর সঙ্গে বিলাসিতায় মগ্ন হয়েছে।

গ্রাম্য ব্যাংক

আজ অবধি শুধু বড় চাষীরাই উন্নত ধরনের চাষ কিছুটা চালু করেছে। ছোট চাষীরা উন্নত ধবনের কৃষি চালু করতে পারেনি, কারণ তাদের হাতে যথেষ্ট পয়সা না থাকায় তারা দরকারী জিনিসপত্র, তেজী বীজ, জলের পাম্প, ঔষধপত্র প্রভৃতি কিনতে পারেনি। ফলে বড় চাষীরা আরও ধনী হয়ে গেছে এবং গ্রামে ধন-বৈষম্য বেড়ে গেছে। ইদানীং সরকার গ্রামে গরীব চাষীদের ঋণ দেবার জন্য গ্রাম্য ব্যাংক খুলবার পরিকল্পনা নিয়েছে। আজ পর্যন্ত পাঁচটা ব্যাংক খোলা হয়েছে এবং আবও ১৫টা ব্যাংক শীঘ্রই খোলা হবে। যতদিন অবধি গ্রামে বড় চাষী, জোতদার ও মহাজনদের প্রাধান্য থাকবে ততদিন গ্রাম্য ব্যাংক খোলা হোক আর ছোট চাষী ও ক্ষেত মজুরদের জন্য অন্য কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক, সব চেষ্টারই ফল তারাই হস্তগত করে নেবে, যেমন নিয়েছে সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি বা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি থেকে। ফলে ধন-বৈষম্য আরও বেড়ে যাবে এবং সুদখোর মহাজনদের তেজারতি কারবারের মূলধন পাওয়া আরও সহজ হয়ে যাবে এইসব গ্রাম্য ব্যাংক থেকে।

মজুরি বৃদ্ধির ফল

গ্রামের ধন-বৈষম্য বজায় রেখে উন্নত ধরনের চাষ চালু করবার আর এক বিপদ আসে চাষী-মজুরদের কাছ থেকে। আমরা আগে বলেছি, ধনী চাষীরাই এই উন্নত ধরনের চাষ করতে পারে; কারণ এ ধরনের চাষে এত বেশী পয়সা লাগে যে ছোট চাষীদের পক্ষে তা

যোগানো সম্ভব নয়। ধনী চাষীদের জমির পরিমাণও বেশী থাকে ; ফলে, ক্ষেত-মজুরদের দৈনিক হারে মজুরি দিয়ে কাজে লাগাতে হয়। চাষে লাভ খুব বেশী হওয়ায় এবং মুদ্রাস্ফীতির জন্য জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় ক্ষেত-মজুররা মজুরি বাড়াবার দাবী করে। এইভাবে পাঞ্জাবে ক্ষেতমজুরের মজুরি দৈনিক ১৯৬১-৬২ সালে ছিল ২ টাকা ৮১ পয়সা। ১৯৬৯-৭০ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৬ টাকা ৩৪ পয়সা। কিন্তু মজুরদের বেতন বারবার ফলে চাষীদের লাভ কমে যায় এবং উন্নত প্রথায় চাষ করবার উৎসাহও কমে আসে।

এদিকে যদি মজুর না খাটিয়ে ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করান হয় তাহলে ফসল এত বেশী পেতে পারে যে ফসলের দাম কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি ফসলের দাম কমে তাহলে লাভও কমে যায়। এরূপ অবস্থায় বড় চাষীর পক্ষে নিজে চাষ না করে জমি ভাগচাষে বা লীজ দিয়ে দেওয়া এবং তার পুঁজিটা সুদে খাটান বেশী লাভজনক হয়। এই কারণে উন্নত ধরনের চাষ ছোট চাষী কি বড় চাষী কেউই তেমন বেশী আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করছে না। এবং তার ফলে আমাদের দেশের খাদ্যসংকটও কমছে না। সুতরাং বড় চাষী, মহাজন ও সাউকারদের হাত থেকে গ্রামের অর্থনৈতিক কাঠামোকে মুক্ত করতে না পারলে আমাদের দেশের চাষের উন্নতি করা খুবই কঠিন হবে।

জমি বণ্টনের নীতি

বড় চাষীদের জমির পরিমাণ কমাবার জন্য সরকার সবচেয়ে বেশী জমি রাখবার একটা সীমা ধার্য করে দিয়েছে। এক এক প্রদেশে এই সীমা এক এক রকম এবং জলসেচওয়ালা জমিতে কম ও জলসেচহীন জমিতে সাধারণত বেশী। কিন্তু প্রত্যেক প্রদেশেই আইন হবার পূর্বে এই সীমা নিয়ে দীর্ঘদিন আলোচনা চলতে থাকে

এবং সেই সময়ের ভেতর বড় চাষী, জোতদার ও জমিদাররা তাদের জমিগুলো আত্মীয়স্বজন, শিশু, বৃদ্ধ, এমন কি জন্ম হয়নি এমন সন্তানদেরও নামে ও বেনামিতে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিয়ে এই আইনকে সম্পূর্ণরূপে বানচাল করে দিতে সমর্থ হয়েছে।

সরকারী কর্মচারীদের দিয়ে এই আইন চালু করার চেষ্টাও সম্পূর্ণ-রূপে ব্যর্থ হয়েছে। বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা স্বভাবতঃই ধনীদের পক্ষে কাজ করে থাকে। তাতে ঝঞ্ঝাটও কম হবার ও আয় বেশী হবার সম্ভাবনা। কাজেই জমি-বন্টনের আইন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। যে ভাবে এই আইন চালু করার চেষ্টা হয়েছে তাতে গুরুতর সন্দেহ করার কারণ আছে যে সরকার সত্যি সত্যি এ-আইন চালু করতে চেয়েছিল কিনা।

আসল কথা, জমি বন্টন বা সরকারী ঋণ বা অন্যান্য আইন-কানুনের ও বিলি-বন্টনের সুবিধা গরীব চাষারা তখনই পেতে পারবে যখন গ্রামের রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের হাতে আসবে। রাজনৈতিক ক্ষমতা যতদিন ধনী শ্রেণীব হাতে থাকবে ততদিন এইসব সুবিধার জন্য যত আইন কানুনই করা হোক না কেন সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। গরীব চাষীদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা আনতে গেলে তাদের একমাত্র উপায় সংঘবদ্ধ হওয়া ও জোরদার সংগঠন তৈরি করা।

আট

শিল্পে জাতীয় অধিকার না ব্যক্তিগত অধিকার

আমরা চার অধ্যায় থেকে সাত অধ্যায় অবধি মিশ্র-পন্থা অনুযায়ী শিল্পে ও গ্রামের জমিতে ধনী শ্রেণীর অধিকার বজায় রেখে আমাদেরদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করাতে যে কুফল ফলেছে ও দেশ যে গুরুতর সংকটের সামনে এসে পড়েছে তাব আলোচনা করেছি। অনেকের মনেই আজ সন্দেহ জাগছে এই মিশ্র বা খিচুড়ি পন্থা দিয়ে দেশ আর এগিয়ে যেতে পারবে কিনা। দেশের বুর্জোয়া ভাবাপন্ন নেতারা ও বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা কিন্তু মিশ্র পন্থাকে বর্জন করে কল-কারখানাগুলোকে সম্পূর্ণ জাতীয় সম্পত্তি করে নিতে প্রস্তুত নন।

দেশের বড় বড় কম্পানিগুলোকে সম্পূর্ণরূপে সরকারের হাতে নিয়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে উচ্চশ্রেণীর লোকেবা এই যুক্তি দেন যে, তাহলে দেশে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষমতা বেড়ে যাবে এবং আমলাতন্ত্রের অত্যাচারে লোকে জর্জরিত হবে। দ্বিতীয়তঃ কল-কারখানা তৎপরতা ও সাফল্যের সঙ্গে চালাবার ক্ষমতা আমলাদেব নেই। কাজেই এসব সরকারেব আওতার এলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদিও আমাদের দেশের সরকারী নেতারা মুখে অন্ততঃ বলেন যে তারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী তথাপি তাঁরা মনে করেন যে কল-কারখানাগুলো জাতীয় সম্পত্তি করে ফেলা উচিত হবে না।

একথা মনে রাখা দরকার যে, যদিও আমাদের দেশের সরকারী নেতারা সমাজতন্ত্রের কথা বলেন, তথাপি মিশ্র উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করবার সময় তারা কতগুলো শিল্প সরকারী আওতায় চালু করেছিলেন সমাজতন্ত্রের খাতিরে নয়, পুঁজিপতিদের এই শিল্পগুলো চালু করবার ক্ষমতা ছিল না বলেই। ১৯৪৮ সালে ও পরে ১৯৫৬সালে

শিল্প সংক্রান্ত যে সরকারী নীতি ঘোষিত হয় তাতে জনসাধারণের উপযোগী (Public utility) শিল্প—যেমন বিদ্যুৎ, রেল, ডাক, জল সরবরাহ, মূল শিল্প—যেমন ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতু তৈরির শিল্প এবং দেশরক্ষার অস্ত্র ও গোলাবারুদ ইত্যাদি তৈরির শিল্পগুলি রাষ্ট্রের হাতে থাকবে। দ্বিতীয়তঃ যে সব শিল্পে অনেক পুঁজি লাগে এবং তৈরি করতে অনেক সময় লাগে আর যার লাভ অনেক দেরিতে পাওয়া যায়, এরকম শিল্পগুলোও রাষ্ট্রের হাতে থাকবে। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে নয় বরং ভারতের পুঁজিপতিদের যথেষ্ট টাকা ও সামর্থ্য নেই বলেই এই শিল্পগুলি রাষ্ট্রের হাতে নেওয়া হয়েছিল। শ্রীমোরারজী দেশাই, তখনকার সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী, পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলেন—

"এটা পরিষ্কার যে বেশীর ভাগ সরকারী অর্থ নিয়োগ করা হয়েছে ভারী শিল্পে এবং সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে দেশে নিপুণতার ও শিল্প জ্ঞানের অভাব আছে ; এবং সরকারী অংশকে কতকগুলো নূতন ধরনের অজানা কিন্তু খুব প্রয়োজনীয় শিল্পও হাতে নিতে হয়েছিল—যেগুলো চালু করা সহজ ছিল না এবং তৈরি করতে অনেক সময় লাগে ও যার উৎপাদন আরম্ভ করা যায় বেশ কয়েক বছর পরে।"[১]

ভারতের পুঁজিপতিরা এই সব শিল্পে তাদের পুঁজি খাটাতে রাজী ছিল না, তাই তখনকার সরকার এই শিল্পগুলি হাতে নিয়েছিল, সমাজতন্ত্রবাদে তাদের বিশ্বাস বলে নয়। আজ অবশ্য এই শিল্প জাতীয়করণ না করার যুক্তিই আবার এসে গেছে। খিচুড়ি-পন্থার গুরুতর কুফল সত্ত্বেও শ্রেণী স্বার্থের খাতিরেই আজও ভারত সরকার কল-কারখানাগুলো সব জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে

১। মোরারজী দেশাই, "Public Sector In a Mixed Economy ;" Vadila Dagli-র সম্পাদিত The Public Sector in India বইয়ের ৩য় পৃষ্ঠা দেখুন।

নারাজ। এর জন্য যে কারণ তারা দেখাচ্ছেন তার যৌক্তিকতা আমরা একটু আলোচনা করে দেখবো।

প্রথম কারণ তারা দেখাচ্ছেন যে, কল-কারখানা জাতীয় সম্পত্তি করে নিলে আমলাতন্ত্রের অত্যাচার বাড়বে। আজ আমাদের দেশে ১১৪টা কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আছে। এছাড়া প্রাদেশিক সরকারগুলোরও অনেক শিল্প ও প্রতিষ্ঠান আছে। এইসব সরকারী প্রতিষ্ঠানে আমাদের দেশের জাতীয় উৎপাদনের ১৫ শতাংশ তৈরি হয়। কৃষিকাজ ও নিজেদের চালিত ব্যবসায় বাদ দিলে সংগঠিত কল-কারখানা ও অফিসগুলোতে যত লোক কাজ করে তাঁর ভেতর শতকরা ৬০ জনই সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত। ১৯৬৫-৬৬ সালের হিসাবে সরকারী কম্পানিগুলোর পুঁজি ছিল ৮৭২ কোটী টাকা। ব্যক্তিগত কম্পানির পুঁজি এর থেকে সামান্য বেশী ছিল—৮৮০ কোটী টাকা। ১৯৭৩ সালে সরকারী কম্পানির পুঁজি বেড়ে দাঁড়ায় ৫,৫৭১ কোটী টাকায়। ব্যক্তিগত কম্পানির পুঁজির ১৯৭২-৭৩ সালের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নি। তবে মোটামুটি ধরা যায় যে, এটা এই বছর শতকবা ১১ ভাগ কমে গিয়েছিল এবং আজকাল সরকারী কম্পানিগুলির পুঁজি ব্যক্তিগত কম্পানির থেকে অনেক উপরে উঠে গেছে। সরকারী উৎপাদন উদ্যোগ এতদূর অবধি বিস্তৃত হয়ে পড়া সত্ত্বেও যদি আমলাতন্ত্রের অত্যাচার না বেড়ে থাকে তাহলে বাকীটুকু রাষ্ট্রের হাত নিয়ে নিলে আমলাতন্ত্রের অত্যাচারের বিশেষ তফাৎ হবে বলে মনে হয় না। অর্থাৎ আমলাতন্ত্রের অত্যাচার বাড়বে এটা বুর্জোয়া শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমতা নিয়ে না নেবার পক্ষে একটা অজুহাত মাত্র। রাষ্ট্রীয় উৎপাদন সংগঠনগুলিকে যদি স্বয়ং পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া যায় তবে আমলাতন্ত্রের অত্যাচার বাড়বার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না।

দ্বিতীয় আপত্তি দেওয়া হয় এই বলে যে কল-কারখানার উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি লাভের অংশ দিয়েই কেবল বিচার

করা হয় তবে রাষ্ট্রীয় কল-কারখানাগুলোর উৎপাদন-দক্ষতা কম বলা যায়। পুঁজিপতিদের কাছে অবশ্য লাভের অংকটাই সবচেয়ে বড় কথা। যত বেশী লাভ হবে সেই কল-কারখানাকে তারা তত দক্ষ বলবে। কিন্তু সরকারী সংগঠনের পক্ষে এ কথা খাটে না। সরকারী সংগঠনকে আরও অন্যান্য অনেক বিষয় ভাবতে হয়,—যেমন জনসাধারণের সুবিধা, বেকারী দূর, দেশের আত্মরক্ষার শক্তি, অন্যান্য শিল্পের পক্ষে উপযোগিতা ইত্যাদি। এই সব ভেঁবে অনেক সময় লোকসান হলেও উৎপাদন চালিয়ে যেতে হয়। অনেক সময় জিনিস-পত্র কম দামে ছাড়তে হয়। অনেক সময় চাষীদের সুবিধার জন্য কাঁচামালের বেশী দাম দিতে হয়। এই সব কারণে মুনাফা কোনো কোনো কারখানায় বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কমও হতে পারে সমগ্র দেশের উন্নতির কথা বিবেচনা করে। কাজেই শুধু লাভ দিয়ে সরকারী উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকে বিচার করা ঠিক হবে না।

তবুও দেখা গেছে, ভারতেব সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি মোটামুটিভাবে বেশ ভাল লাভই চালু রেখেছে। প্রথম দিকে অবশ্য সরকারী বেসরকারী সব প্রতিষ্ঠানকেই লোকসান দিতে হয়। আমাদের দেশের সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোও দিয়েছে। কিন্তু এখন ক্রমেই সেগুলোর অবস্থা উন্নতির দিকে যাচ্ছে। এর অবশ্য একটা বড কারণ, এই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার উন্নতি।

প্রথম প্রথম সরকারী আমলাদের দিয়ে সরকারী দপ্তরের মতনই এইসব কল-কারখানা ও ব্যবসায়-সংগঠনগুলোকে চালান হ'ত। ফলে উৎপাদনে লাভ না বেড়ে শুধু খরচের ভাগটাই বাড়ত। তাছাড়া মন্ত্রীদের মনোনীত লোকদের চাকুরি, ঘুষ ও চুরি, শ্রমিকদের উপর বড় সাহেবদের হম্বি-তম্বি ইত্যাদি কারণে উৎপাদন কম হত। আজকাল ম্যানেজার ও উঁচুশ্রেণীর কর্মচারীরা সরকারী আমলা না হয়ে বেশীর ভাগই কারখানা ও ব্যবসায়ী সংগঠন পরিচালনার বিজ্ঞানে শিক্ষিত লোক। দ্বিতীয়তঃ শ্রমিকদের সহযোগিতার উপরও আজকাল

কলে কারখানায় অনেক বেশী জোর দেওয়া হয়। ফলে অনেক সরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান আজকাল ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের থেকে অনেক বেশী সফলতার সঙ্গে চালু হয়েছে।

শুধু লাভ দিয়ে বিচার করলেও দেখা যাবে যে সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলি আজকাল খুব যে খারাপ করছে তা নয়। ব্যক্তিগত বড় ও মাঝারি কম্পানিগুলির লাভের হার ১৯৭১-৭২ সালে ছিল মোট বিক্রীর শতকরা ৯ টাকা ৯০ পয়সা। ১৯৭২-৭৩ সালে এই হার কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৯ টাকা ৪০ পয়সায়। সরকারী কম্পানিগুলোর লাভ ছিল ১৯৭১-৭২ সালে শতকরা ৪ টাকা ৫০ পয়সা। এই হার বেড়ে গিয়ে ১৯৭২-৭৩ সালে দাঁড়ায় শতকরা ৫ টাকা ৩০ পয়সা।[১] সুতরাং সরকারের হাতে গেলেই উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং কল-কারখানা দেউলিয়া হয়ে যাবে এ কথা ঠিক নয়। প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বশাসিত ও স্বয়ং পরিচালনার অধিকার দিলে এবং উপযুক্ত অভিজ্ঞ ও পরিচালনা-বিজ্ঞানে শিক্ষিত এবং গণতান্ত্রিক ভাবাপন্ন কর্মকর্তা নিয়োগ করলে উৎপাদন-ক্ষমতা ব্যক্তিগত কারখানা থেকে বেশী ভাল ভাবে চলবে। সঙ্গে সঙ্গে খিচুড়ি প্রথার যে কুফল আমরা আগে আলোচনা করেছি, যেমন উৎপাদন ক্ষমতার অপচয় ও বিকৃতি, সামাজিক ও নৈতিক অবনতি, মুদ্রাস্ফীতি, দারিদ্র্য ও বেকারবৃদ্ধি, সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাধান্য ও কৃষির উন্নতির পথে বাধা ইত্যাদিও দূর হবে। সবচেয়ে বড় কথা—অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা কাজে লাগান সহজ হবে। ফলে দেশের দ্রুত উন্নতি হতে থাকবে।

এ কথা স্বীকার করতে হবে যে আমাদের দেশের সরকারী কারখানাগুলোর পরিচালনা ব্যবস্থাকে আরও অনেক বেশী উন্নত ও কার্যকরী করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী

১। এই হিসাব রিজার্ভ ব্যাংকের "Studies on Company Finances' October 1974, Supplement-এ ১২ ও ২৪ পৃষ্ঠায় আছে।

গরীব সব শ্রেণীর লোকের ভেতর জাতিভেদ প্রথা ও উঁচু নীচু বোধ এরকম মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে আছে যে, উঁচুশ্রেণীর লোকেরা যারা বেশীর ভাগ ম্যানেজার ও কারখনার কর্মকর্তা হবার সুযোগ পায় তারা নীচু শ্রেণীর ও নিম্নতম কর্মচারীদের মানুষ বলে গণ্য করে না। ফলে, শ্রমিক ও পরিচালকদের ভেতর একটা বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে থাকে। তেমনি আবার শ্রমিকদের নিজেদের ভেতর শুধু জাতি নিয়ে নয়, ভাষা নিয়ে, ধর্ম নিয়ে, প্রদেশ নিয়ে, বিভিন্ন দলাদলির সৃষ্টি হয়, যার ফলে এক একটা কলে অনেকগুলো ক'রে শ্রমিক সংঘ গড়ে ওঠে। শ্রমিকরা এর ফলে খুব দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের দাবী দাওয়া সহজে আদায় করতে সক্ষম হয় না। শুধু যে শ্রমিকরা নিজেদের এই একতার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয় উৎপাদনের ক্ষতি হয়। কারণ, সরকারী কারখানাগুলোতেও শ্রমিকরা তাদের নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধি যে জড়িত আছে তা বুঝতে পারে না। নিজেদের ভেতর দলাদলি ও উপরওয়ালা অফিসারদের উদ্ধত ব্যবহারের ফলে তারা তাদের নিজেদের ছোট ছোট স্বার্থ ও সাময়িক সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত থাকে।

সুতরাং উৎপাদন বাড়াতে গেলে এবং উন্নত ধরনের পরিচালনা চালু করতে গেলে যেমন ম্যানেজার অফিসার শ্রেণীকে আরও অভিজ্ঞ এবং অনেক বেশী গণতান্ত্রিক ভাবাপন্ন হতে হবে, তেমনি শ্রমিকদেরও একতার প্রয়োজনীয়তা ও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থের সম্বন্ধ ভাল করে উপলব্ধি করতে হবে। কারখানা যদি পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকে তাহলে অবশ্য এটা কখনই সম্ভব হবে না। এব কারণেই কারখানাগুলো জাতীয়করণ করলে তার উৎপাদন অনেক বেশী হবে, কারণ তখন শ্রমিকেরা এই কারখানাগুলোকে নিজেদের সম্পত্তি জেনে অনেক বেশী উৎসাহে কাজ করবে।

উপরওয়ালাদের উদ্ধত ব্যবহার ও শ্রমিকদের ভেতর দলাদলি ও সহযোগিতার অভাব ছাড়াও সরকারী কম্পানিগুলোর আরও

অনেক উৎপাত সহ্য করতে হয়, যেগুলো দূর করলে সরকারী কম্পানির কর্মকুশলতা অনেক বৃদ্ধি পাবে। প্রথমতঃ মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতা-লোলুপতা ও দুর্নীতি এই কম্পানিগুলোর সফলতার একটা বড় অন্তরায়। তাদের পৃষ্ঠপোষকদের চাকুরি, তাদের বংশবদ ব্যবসায়ীদের কেনাবেচার দালাল নিযুক্ত করা, নিজেদের ঘুষ আদায়ের নানারকম ফন্দি, এই সব কারণে অনেক সময় ম্যানেজারদের সদিচ্ছা থাকলেও অনুপযুক্ত লোকদের কাজে নিযুক্ত করতে হয় ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বেশী দামে মাল কিনতে হয় কিংবা তৈরি মাল কম দামে বিক্রী করতে হয়। এই সব দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে গিয়ে অনাবশ্যক প্রচুর ব্যয় হয়ে যায় ও উৎপাদন ব্যাহত হয়।

দ্বিতীয়তঃ সরকারী আমলাদের উৎপাত ও আমলাতন্ত্রী মনোবৃত্তি অনুযায়ী ব্যবসা চালানোর চেষ্টা এবং আইনসভার অনাবশ্যক তদারকিও অনেক সময় এই ব্যবসা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

এইসব রাজনৈতিক আমলাতান্ত্রিক উৎপাত দূর করতে হলে সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ চালাবার দায়িত্ব দেওয়া দরকার। যথেষ্ট উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ ম্যানেজার নিযুক্ত করে তাঁদের হাতে কাজ চালাবার, লোক নিযুক্ত করবার ও কেনাবেচার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া দরকার।

আইনসভার, মন্ত্রীদের ও আমলাদের দায়িত্ব হবে শুধু বছরের শেষে ঐ প্রতিষ্ঠান ব্যবসা ও উৎপাদন ঠিকমত ও সফলতার সঙ্গে করল কিনা তার একটা হিসাব-নিকাশ করা। এরূপ স্বয়ং নিয়ন্ত্রণ ও স্বয়ং শাসন রীতি চালু করলে এবং কর্মকর্তাদের ব্যবসা, উৎপাদন, কর্মচারী নিয়োগ ও টাকা পয়সা লেনদেনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে এবং শ্রমিকদের সহযোগিতা পেলে সরকারী কম্পানিগুলি ব্যক্তিগত কম্পানিগুলির চাইতে অনেক ভাল চলবে

সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যেহেতু সরকারী কম্পানিতে শ্রমিক ও কর্মচারীদের শোষণ ক'রে লাভের অংশকে খুব বাড়াবার প্রশ্ন উঠে না, সেজন্য শ্রমিক ও কর্মচারীদের সহায়তা ও আন্তরিকতা কম্পানিগুলি যতটা পাবে, ব্যক্তিগত কম্পানির পক্ষে তা কখনই সম্ভব নয় এবং এই সহযোগিতার ফলে তাদের উৎপাদন অনেক বেশী হওয়া কিছুই আশ্চর্যের নয়। রাজনৈতিক নেতাদের ও আমলাতন্ত্রীদের অনাবশ্যক তদারকি থেকে মুক্ত করে এই কম্পানি-গুলোকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া উচিত। তাহলে ব্যক্তিগত কম্পানিগুলো থেকে তারা অনায়াসেই অনেক বেশী ভাল কাজ দেখাতে পারবে।

নয়

পুঁজিবাদের সংকট ও ভারত সরকারের পরস্পর-বিরোধী নীতি

খিচুড়ি পন্থায় দেশের অর্থনীতি চালাবার ফলে ধীরে ধীরে দেশ এমন একটা অবস্থায় এসে পড়ছে যেখানে উৎপাদন কাঠামোর উন্নতি প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। শিল্পের উন্নতির গতি ক্রমেই কমে আসছে। শুধু টাকার নোট ছাপিয়ে উন্নত ধরনের চাষপ্রথাকেও আর বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখা যাচ্ছে না। এরূপ অবস্থায় শিল্পপতিরা দাবী তুলেছে উৎপাদনের সরকারী অংশ তাদের হাতে ছেড়ে দিতে, যাতে এই অংশ থেকেও তারা লাভ উঠাতে পারে। বড় চাষীরা, জমিদার ও মহাজনরা দাবী তুলেছে ফসলের দাম ঠিক করার ভার তাদের হাতে ছেড়ে দিতে। শক্তিশালী শিল্পপতিদের ও বড় জমির মালিক এবং মহাজনদের প্রতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের ও রাজনৈতিক নেতাদের সহানুভূতি বরাবরই আছে। কাজেই তাদের এই দাবী-গুলি উচ্চপদস্থরা সহজেই মেনে নিতে চাইছে। শিল্পপতিরা নিজেরা শিল্পের বৃদ্ধি সাধন করতে অসমর্থ; কাজেই তারা পশ্চিমের ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী দেশের শিল্পপতিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছে, এদেশে এসে যুক্তফ্রন্ট তৈরি করে মিলেমিশে ভাগাভাগি করে দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ করতে।

এদিকে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ, চাষী, মজুর ও মধ্যবিত্ত লোকেরা মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারীর জ্বালায় জর্জরিত হয়ে ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে। তারা দাবী তুলেছে জমি চাই, মজুরী বৃদ্ধি চাই ও সস্তা ঋণের ব্যবস্থা চাই। ফলে সরকার একদিকে যেমন পুঁজিপতিদের দাবীকে মেনে নিয়ে ব্যক্তিগত উৎপাদনের অংশ বাড়িয়ে

দিচ্ছে এবং বিদেশী পুঁজিপতিদের এদেশে সুবিধা করে দিচ্ছে,[১] তেমনি সঙ্গে সঙ্গেই আবার দরিদ্র জনসাধারণদের জন্য বেকারী দূর করবার, কম সুদে ঋণ দেবার ও দিন মজুরদের সর্বনিম্ন বেতন ধার্য করবার এবং জমিহীনদের জমি দেবার একটা কর্মপন্থাও গ্রহণ করেছে।

এই দুই পরস্পর-বিরোধী নীতি নিয়ে পথ চলা বেশীদিন সম্ভব হবে না। জাতীয় সরকারকে এই দুইএর যে কোনো একটা পথ বেছে নিতে হবে। কোন পথ জাতীয় সরকার বেছে নেবে তা নির্ভর করবে পুঁজিপতিদের তুলনায় দরিদ্র জনসাধারণ কতখানি সচেতন ও সংঘবদ্ধ তার উপর। যদি দরিদ্র জনসাধারণ, বিশেষ করে দরিদ্র চাষী ও মজুররা, পুঁজিবাদীদের ও মহাজন-সুদখোরদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ না হতে পারে এবং তাদের নানা প্রকার বিভেদকারী চাল-বাজির বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে না পারে, তা হ'লে পুঁজিবাদীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে নিয়ে নিজেদের একনায়কত্ব স্থাপন করবে। যদি দেশের সরকার পুরোপুরিভাবে পুঁজি-বাদীরা ও মহাজন সুদখোররা দখল করে নিতে পারে তা হ'লে দুঃস্থ জনগণ ও দরিদ্র চাষীরা ধনী শ্রেণীর কেনা গোলামে পরিণত হবে। তাদের অবস্থার উন্নতির কোনো আশাই আর থাকবে না।

শুধু যে জাতীয় সরকারকে পুঁজিবাদীদের একচেটিয়া অধিকার থেকে বাঁচানোর জন্য ক্ষেত মজুর, দরিদ্র চাষী, শহরের শ্রমিক ও নীচু স্তরের মধ্যবিত্ত লোকদের সংঘবদ্ধ হয়ে একতার সঙ্গে বড় বড়

১। ১৯৬৪ সালে সব চেয়ে বেশী সংখ্যায় বিদেশী কম্পানিগুলো আমাদের দেশে যুক্ত ব্যবসায়ের জন্য আসে। এই বছর এদের সংখ্যা ছিল ৪০৩। এই সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১৯৬৮ সালে ১৩১ টা। তারপর থেকে প্রতি বৎসর এদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে এদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৩৫৯ এ। এ থেকেই বোঝা যায় যে, সরকারী নীতি আমাদের দেশে বিদেশী কম্পানির প্রসারের পক্ষপাতী।

পুঁজিপতি, বড় বড় জমির মালিক-মহাজনদের সঙ্গে লড়াই করা দরকার তা নয়, নিজেদের রুজি-রোজগার বাঁচাবার ও বাড়াবার জন্যও তাদের একত্রিত এবং সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াই করা দরকার। তাদের একতাবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন দৈনিক রুটির জন্য; ছেলেপিলের মুখে দুটি ভাত যাতে পড়ে তার জন্য। দয়া ক'রে জমির মালিক বা মহাজন বা কল-কারখানার মালিক তাদের অবস্থার উন্নতি করে দেবে—এ আশা করা বৃথা। একা একা নিজের চেষ্টায় কিছু ঘুষ দিয়ে কিংবা ধরাধরি করে তারা তাদের অবস্থা ফিরিয়ে ফেলতে পারবে তার আশাও দুরাশা। একমাত্র পথ ও বাঁচার উপায় তাদের সংঘবদ্ধ হয়ে, একতা বজায় রেখে ধনী শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। স্তরবিভক্ত সমাজে শাসন ক্ষমতা যতদিন উঁচুশ্রেণীর হাতে থাকে, ততদিন যত ভাল আইন কানুনই সরকার পাশ করুক না কেন, তা কখনই নীচু শ্রেণীর মঙ্গলের জন্য কাজে লাগান হয় না।

তৃতীয় ভাগ

দরিদ্রের আত্মরক্ষার উপায়

দশ

চাষীদের সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা

গরীব চাষীদের সংঘবদ্ধ হওয়া দরকার প্রথমতঃ শোষণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে রুজি-রোজগার বাড়িয়ে নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য; দ্বিতীয়তঃ চাষের ও শিল্পের তথা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য; তৃতীয়তঃ দেশের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য। আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে দেখেছি, জমিদার, বড় বড় চাষী, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের শোষণের ফলে চাষীরা পুঁজিবাদী নিয়ম অনুযায়ী শীঘ্রই সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে। চাষের জন্য হাল, গরু, বীজ, ইত্যাদি অথবা পূজা-পার্বণ, বিবাহ ও অসুস্থতার জন্য তাদের টাকার দরকার হয়। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হয়ে গেলে খাবার কিছু থাকে না—ধার ক'রে তখন তাদের সংসার চালাতে হয়। এই সব কারণে চাষীকে বড় বড় ধনী চাষী, জমিদার, মহাজন বা ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে হাত পাততে হয় টাকা ধার করার জন্য। তখন এমন উচ্চ হারে ধনীরা চাষীদের ধার দেয় যে একবার টাকা ধার করলে চাষীরা সারা জীবনে আর তা শোধ করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বাপ, ছেলে, নাতি, এমন কি বংশের পর বংশ মহাজন ও বড় চাষীর গোলামী করেও সে ধার শোধ হয় না। চাষীদের যেটুকু জমিজমা থাকে, এমন কি স্ত্রীর গয়নাগাটি, বাসনপত্র ইত্যাদিও এই দেনার দায়ে বিকিয়ে দিতে হয়, তবুও সে দেনা শোধ হয় না। ফলে কিছু দিনের ভেতরেই চাষীরা নিজেদের জমি হারায় ও ক্ষেত মজুর বা ভাগ-চাষীতে পরিণত হয় বা নিজেদের জমিতেই তখন তারা জমিদার, মহাজন বা বড় চাষীর ক্রীতদাস হয়ে থাকে। তাদের কাঁধে ঋণের বোঝার উপর জমির খাজনার বোঝা চাপে। ফলে তারা বংশপরম্পরায় দরিদ্র হয়ে পড়ে।

এই দারিদ্র্যের বোঝা নামাতে গেলে তাদের সংঘবদ্ধ হয়ে জমিদার, মহাজন, বড়চাষী ও জোতদারের বিরুদ্ধে লড়াই করা দরকার; তা ছাড়া সঙ্গে সঙ্গে যাতে নিজেরাই অল্প সুদে এবং অল্প খাজনা দিয়ে জমি চাষ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার।

জমির লড়াই

চাষীদের সবচেয়ে বড় লড়াই হল জমির লড়াই। ভারতবর্ষের প্রতি প্রদেশেই আইন পাশ হয়েছে যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী জমি কেউ ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু জমিদার, জোতদার, বড় চাষীরা যে বেনামীতে জমি রেখে এবং ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনীদের ও আত্মীয়স্বজনদের নামে জমি লিখিয়ে নিয়ে এই আইন ফাঁকি দিয়েছে তা পূর্বেই বলা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা বে-আইনী ভাবে সরকারী জমিও দখল করে নিজেদের নামে লিখিয়ে নিয়েছে। গরীব চাষীদের কাজ হবে সংঘবদ্ধ হয়ে এইসব বে-আইনী দখল-করা জমি জমিদার, জোতদার, মহাজনদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা।

এই কাজ করতে গেলে গ্রামের ধনীদের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লেগে যাবে। ধনীদের হাতে টাকার জোর আছে; পুলিশ ও সরকারী কর্মচারী অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে; এমন কি অনেক জমিদার, জোতদার ও মহাজনরা ভাড়াকরা গুণ্ডা পোষে গরীব চাষীদের শায়েস্তা করবার জন্য। কাজেই নিজেদের সংঘবদ্ধ করে খুব জোরদার করতে না পারলে এই সংগ্রামে গরীব চাষীরা জিততে পারবে না। তাদের নেতারা মার খাবে এবং পুলিশের লোক তাদের জেলে পুরে দেবে। জমিদার মহাজনদের গুণ্ডাবাজী ও পুলিশের জুলুম থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে তাদের সংঘবদ্ধ হয়ে জমির আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। দৃঢ়তার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম চালালে বেদখলী জমি আইনানুসারে দরিদ্র চাষীর অধিকারে নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

সরকারী আইনে সবচেয়ে বেশী জমির যে সীমা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে তার থেকে বেশী বা উপরি জমি যদি কোনো ধনী জমিদার, মহাজন বা জোতদার লুকিয়ে রেখে থাকে বা সরকারী জমি বেনামীতে বা অন্য কোনো উপায়ে বেআইনীভবে দখল করে রেখে থাকে তবে সে জমি উদ্ধার করে গরীব প্রকৃত চাষীদের ভেতর ন্যায্যভাবে বণ্টন করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা চাষীসংঘের প্রধান কাজ।

জোতদার, বড় চাষী, জমিদার, মহাজন, ব্যবসায়ী বা সরকারী কর্মচারীরা যদি "উপরি জমি" লুকিয়ে রাখতে সমর্থ না হয় এবং যদি তারা তাদের "উপরি জমি" গরীব চাষীদের দিয়ে দিতে বাধ্য হয় তাহলে স্বভাবতঃই তারা তাদের সব চেয়ে খারাপ জমিই গরীব চাষীদের দেবে। এভাবেও যাতে তারা আইন ফাঁকি দিতে না পারে এবং গরীব চাষীদের ঠকাতে না পারে চাষীসংঘকে সেদিকেও নজর রাখতে হবে। যেহেতু গ্রামের শতকরা ৯৭ জনই হ'ল গরীব ভূমিহীন চাষী বা ছোট বা মধ্যবিত্ত চাষী, তারা যদি একজোট হয়ে দাবী করে তাহ'লে বাকী ৩ জনের কাছ থেকে ভাল জমিও আদায় করা কষ্টকর হবে না।

যেহেতু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জমিদার মহাজনরা অন্যায় ভাবে গরীব চাষীদের দুঃস্থ অবস্থার সুযোগ নিয়ে এইসব জমির মালিকানা হস্তগত করেছে, তাই তাদের এই জমি গরীব চাষীদের বিনে পয়সায়, বিনে খেসারতেই দিয়ে দেওয়া উচিত। তথাপি শান্তিপূর্ণ ভাবে এবং কম বাধা সৃষ্টি করে এই কৃষি-বিপ্লব সফল করার জন্য তাদের একটা খেসারৎ দেওয়া যেতে পারে। এই খেসারতের পরিমাণ জমিতে গড়পড়তা যা ফসল হয় তার ৫।৬ গুণের বেশী হওয়া উচিত নয়। সরকারী ব্যাংক থেকে কম সুদে টাকা ধার করে সেই খেসারত দেওয়া যেতে পারে। যে সব চাষীরা জমি পাবে, পরে বছর বছর অল্প অল্প করে ২০।৩০ বছরে তাদের কাছ থেকে এই টাকাটা আদায় করে নেওয়া যেতে পারে। সংঘবদ্ধভাবে চাষীদের সভা জমি বণ্টনের,

খেসারতের পরিমাণ ধার্য করার ও চাষীদের কাছ থেকে ২০।৩০ কিস্তিতে টাকা আদায়ের দায়িত্ব নিতে পারে। সরকারী চাকুরেদের হাতে এই দায়িত্ব ছেড়ে দিলে চাষীদের বঞ্চিত হবার সম্ভাবনা খুব বেশী।

জমিদার, মহাজন ও বড় চাষীরা সকলেই এক রকম নয়। এদের ভেতরও অনেক আছে যারা চাষীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। যারা ইতিহাসের ধারা ও রাজনীতির গতি পরিষ্কার বুঝতে পারে এবং চাষীদের উপর যে অন্যায় সমাজ-ব্যবস্থা চাপান হয়েছে তা বোঝে, তারা কিছু না কিছু চাষীদের প্রতি ভাল ব্যবহার করার চেষ্টা করে এবং তাদের আন্দোলন সহানুভূতির চক্ষে দেখে। উঁচু শ্রেণীর এই ধরনের লোকেদের ও তাদের পরিবারবর্গের প্রতি চাষীরা নিশ্চয়ই সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করার এবং তাদের জমির ন্যায্য দাম ধরার চেষ্টা করবে। অন্যদিকে অত্যাচারী, গুণ্ডাবাজ ও লোভী জমিদার মহাজনদের ও সরকারী কর্মচারীদের প্রতি অধিকতর কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

জমি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই যে চাষীর দুঃখ ঘুচে যাবে তা নয়। চাষের জন্য ও জীবনের নানা দুর্ঘটনা, অসুখ-বিসুখ ও জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদির জন্য টাকার দরকার। সে টাকা না পেলে চাষীদের ভেতর যারা একটু অবস্থাপন্ন তারা আবার মহাজন-সুদখোর হয়ে উঠবে এবং দরিদ্র চাষীরা আবার তাদের খপ্পরে পড়বে। সুতরাং সস্তায় ঋণের ব্যবস্থা করা জমি বণ্টনের মতই অত্যন্ত আবশ্যক। সস্তায় ঋণ পাবার ব্যবস্থা নানা রকম ব্যাংকের মারফৎ সরকারকেই করে দিতে বাধ্য করতে হবে। এই ব্যাপারেও চাষীসংঘকে দায়িত্ব নিতে হবে যাতে চাষীরা উপযুক্ত পরিমাণে এবং কম সুদে টাকা ধার পায়। তেমনি আবার চাষীসংঘ চাষীদের সংযত করবে যাতে তারা বিশেষ করে সাধ-ভক্ষণ, জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যুতে বা পূজাপার্বণে অনাবশ্যক ভাবে বেশী টাকা খরচ না করে। উপযুক্ত ভাবে চাষের উন্নতির জন্য

যাতে ঋণের টাকা খরচ করে সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে চাষী-সংঘকে।

বাড়ীঘর তৈরি, কুয়া খনন ও চাষের অন্যান্য কাজে চাষীরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করবে যাতে এইসব কাজের জন্য চাষীকে ঋণ করতে না হয় বা অযথা বেশী টাকা খরচ করতে না হয়। তাছাড়া তারা সমবেতভাবে চেষ্টা করবে গ্রামের স্কুল-ঘর, হাসপাতাল ও রাস্তা-ঘাট তৈরি করতে ও মেরামত করতে। মোটকথা, চাষীসংঘ গ্রামে গরীব চাষীদের জীবনে একটা নূতন সাড়া জাগিয়ে তুলবে, যাতে চাষীরা একতাবদ্ধ হয়ে নিজেদের জীবনে আবার একটা আশার আলো ফুটিয়ে তুলতে পারে। ধনী শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যেমন চাষীসংঘ নেতৃত্ব দেবে এবং চাষীদের একতাবদ্ধ করে লড়বে, তেমনি তাদের চাষের কাজে ও শিক্ষা-দীক্ষায়, আনন্দ-উৎসবে, এমন কি দুঃখ-শোকেও চাষীরা যেন পরস্পরকে সাহায্য ও সামাজিক জীবন যাপন করে তাও শেখাবে। এরূপ একতাবদ্ধ হয়ে না চললে একটি একটি করে চাষীকে ধনী শ্রেণীর লোকেরা সর্বস্বান্ত করে দেবে এবং যুগ যুগ ধরে বংশপরম্পরায় তাদের দাস করে রাখবে।

কৃষি ও শিল্পের উন্নতি

শুধু যে চাষীদের নিজেদের প্রয়োজনে আজ তাদের একতাবদ্ধ হয়ে চাষীসংঘ স্থাপন করা দরকার তা নয়, দেশের ভবিষ্যৎও আজ পুরোপুরিভাবে এই চাষীসংঘের সাফল্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আমরা দেখেছি খিচুড়ি-পন্থায় উৎপাদন চালিয়ে আমাদের দেশের উন্নতি আজ প্রায় বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির চাপে দেশের বেশীর ভাগ লোক ক্রমেই দুঃস্থ হয়ে পড়েছে এবং দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের হাতে গিয়ে জমা হয়েছে; নূতন নূতন কলকারখানা স্থাপন করার ফলে একদিকে যেমন দেশের

উৎপাদন শক্তি বেড়ে গেছে তেমনি লোকের দারিদ্র্যও বেড়েছে। কিন্তু বাজার তেমন বাড়ছে না। তাই পুঁজিপতিরা উৎপাদন-ক্ষমতা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারছে না এবং তাদের লাভ বেশী হচ্ছে না। এর ফলে দেশে শিল্পের প্রসার যত দ্রুত হওয়া প্রয়োজন ছিল ততটা হচ্ছে না। অন্যদিকে চাষেরও প্রয়োজনমত দ্রুত উন্নতি হচ্ছে না; কারণ পুঁজিপতিরা বা বড় বড় চাষীরা উন্নত প্রথায় চাষ করে যা লাভ পায় তার থেকে বেশী লাভ করছে গরীব চাষীদের বেশী সুদে টাকা ধার দিয়ে এবং উচ্চ হারে খাজনা আদায় করে। কাজেই যতদিন অবধি সরকার উচ্চ হারে বড় চাষীদের ফসল কিনছে এবং সস্তায় তেজী বীজ ও সার ইত্যাদি চাষের দরকারী দ্রব্য-সামগ্রী দিতে পারছে ততদিনই তারা উন্নত প্রথায় চাষের উৎসাহ দেখাচ্ছে। যখনই ফসলের উচ্চতম দাম ধার্য করার কথা সরকার বলছে কিংবা সস্তায় দ্রব্য-সামগ্রী দেবার অক্ষমতা জানাচ্ছে তখনই তাদের আর চাষবাসে উৎসাহ থাকছে না, সুদ ও খাজনা আদায়ের দিকেই তাদের বেশী নজর চলে যাছে।

আমাদের দেশে কৃষিই হল উৎপাদন কাঠামোর সবচেয়ে বড় বিভাগ। শতকরা ৫০ এরও বেশী উৎপাদন কৃষি থেকেই হয়ে থাকে। এই মস্তবড় উৎপাদন বিভাগকে দান খয়রাতি করে বাঁচিয়ে রাখা উৎপাদনের অন্য ছোট বিভাগগুলির পক্ষে বেশী দিন সম্ভব নয়। তাদের উপর প্রচুর করভার চাপিয়েও যথেষ্ট টাকা উঠছে না। ফলে টাকার নোট ছাপিয়ে ভারত সরকার এই দান খয়রাতির টাকা যোগাড় করতে বাধ্য হচ্ছে। এই জন্যে দেশে মুদ্রাস্ফীতি আটকানো যাচ্ছে না। ফলে দেশের বেশীর ভাগ লোকের সর্বনাশ হচ্ছে। কাজেই মিশ্র পন্থা বজায় রেখে পুঁজিবাদী প্রথায় উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া আমাদের দেশে আর সম্ভব হচ্ছে না। এই প্রথায় শিল্পের ও কৃষির উভয়েরই শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। উৎপাদন বাড়ছে না বিশেষ। এদিকে লোকসংখ্যা বাড়ছে ও লোকের দারিদ্র্যও বাড়ছে।

এই অচল অবস্থা থেকে দেশের উৎপাদন প্রথাকে মুক্ত করতে হলে একমাত্র পথ গরীব চাষীদের মজবুত সংগঠন, গরীবদের ভেতর জমি বণ্টন ও অল্প সুদে গরীব চাষীদের তাদের সংঘ মারফৎ ঋণ দানের ব্যবস্থা এবং উন্নত ধরনের চাষের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্য বণ্টনের ব্যবস্থা করা। গরীব চাষীরা জমি পেলে উৎসাহের সঙ্গে চাষ করে জমি থেকে দ্বিগুণ, তিনগুণ ফসল তুলতে পারবে। তাদের অবস্থা ভাল হলে কল-কারখানায় তৈরি জিনিসপত্র কেনবার সামর্থ্য তাদের বেড়ে যাবে। এইভাবে চাহিদা বাড়লে শিল্পেরও দ্রুত উন্নতি হবে। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট থেকে দেশকে উদ্ধার করে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি করতে গেলে তার প্রধান উপায় হল গরীব চাষীদের সংঘবদ্ধ হওয়া এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে শোষণের ভার ঘুচিয়ে দিয়ে চাষের উন্নতির দায়িত্ব তাদের নিজেদের হাতে নেওয়া। যতদিন পর্যন্ত সরকারী কর্মচারী ও পুলিশের সহায়তায় দেশের জোতদার মহাজনরা গুণ্ডা লাগিয়ে গরীব চাষীদের দাবিয়ে রাখবে ততদিন দেশের এই অর্থনৈতিক সংকট ঘুচবে না। যেদিনই গরীব চাষীরা সংঘবদ্ধ হয়ে জমি ও চাষের দায়িত্ব নিজেদের হাতে নেবে সেদিন থেকেই আরম্ভ হবে দেশের দ্রুত উন্নতি।

ধনী শ্রেণীর শোষণের ফলে দেশে যে অর্থনৈতিক সংকট ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে তার সমাধান দেশের ধনী শ্রেণীর শাসকেরা খুঁজছে বৈদেশিক বিশেষ করে মার্কিনী সাহায্যে। এই সাহায্য নিতে গিয়ে তারা দেশের সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতা বিপন্ন করছে। কেমন করে করছে তা আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব।

এগার

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ও দেশের স্বাধীনতা

দরিদ্র চাষী ও মজুরদের সংঘবদ্ধ হয়ে শোষণকারী পুঁজিবাদীদের সঙ্গে সংগ্রাম করা শুধু যে তাদের নিজেদের আত্মরক্ষা ও রুজি-রোজগারের জন্য ও দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্যই কেবল দরকার তা নয়, দেশের স্বাধীনতা বাঁচাবার জন্যও আজ বিশেষ করে এই একতা ও সংগ্রামের দরকার হয়ে পড়েছে। দেশের পুঁজিপতিরা, আমরা আগের অধ্যায়গুলোতে দেখেছি, দেশের বেশীর ভাগ লোককে শোষণ করে নিঃস্ব করে দিয়ে নিজেরাই আজ বাজারের সংকোচন করে ফেলেছে। ফলে হাতে যথেষ্ট টাকা থাকা সত্ত্বেও তা তারা খাটাতে পারছে না। অন্যদিকে চাষী মজুর শ্রেণী ক্রমেই সজাগ হয়ে উঠছে, তাদের আগের মত যদৃচ্ছা শোষণ করা যাচ্ছে না। এই সব সংকট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পুঁজিপতিরা ক্রমেই বিদেশী শক্তি-শালী পুঁজিবাদীদের শরণাপন্ন হয়ে পড়ছে।

দেশের ধনী শ্রেণীর একটা বড় অংশ যখন ক্রমেই বিদেশীদের সাহায্যে তাদের শোষণ ব্যবস্থা পাকা করার জন্য দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন করতে কুণ্ঠাবোধ করে না তখন দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার একমাত্র উপায় চাষী মজুরদের মজবুত সংগঠন তৈরি করা এবং তাদের শীঘ্র রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা যাতে তারা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে এবং পুঁজিবাদীদের চক্রান্ত থেকে দেশকে বাঁচাতে পারে। চাষী ও মজুর ও দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকই ভারতের শতকরা ৯৫ জন। এরা যদি সংঘবদ্ধ হয়ে একজোট হতে পারে তবে এমন কোনো বিদেশী বা দেশী পুঁজিবাদী শক্তি নেই যারা এদের প্রতিরোধ ও আক্রমণের সামনে টিকতে পারবে। একথাও

মনে রাখা দরকার যে, পুঁজিপতিদের ভেতরও এমন অনেক লোক আছে, বিশেষ করে ছোট ছোট শিল্পপতিদের ভেতর যারা বড় বড় পুঁজিপতি ও আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলির প্রতিযোগিতার ফলে শঙ্কান্বিত ও ক্ষতিগ্রস্ত, তারা তাদের নিজেদের স্বার্থের তাগিদেই আন্তর্জাতিক কম্পানি ও তাদের সহচরদের বিরোধিতা করতে উৎসাহিত হয়।

সুতরাং আমাদের দেশের সকল পুঁজিপতিরাই যে সমানভাবে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে স্বার্থ মিলিয়ে নিজেদের লাভের জন্য দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিতে ইচ্ছুক সে কথা সর্বাংশে ঠিক নয়। পুঁজি-পতিদের ভেতরও নানা রকম স্বার্থের সংঘাত আছে। বিশেষ করে ছোট ছোট পুঁজিপতিদের সর্বক্ষণই বড় বড় পুঁজিপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিপর্যস্ত হতে হয়। একচেটিয়া মাল কেনা-বেচার সুবিধা, ব্যাংক থেকে টাকা ধার পাওয়ার সুবিধা, সরকারী কর্ম-চারীদের কাছ থেকে নানারকম সুবিধা ইত্যাদি সব রকম ব্যপারেই বড় বড় পুঁজিপতিদের কাছে ছোট ছোট পুঁজিপতিদের হার মানতে হয়। এই সব কারণে তারা যা লাভ করে বড় পুঁজিপতিদের তুলনায় তা কম হয়। যেমন, ১৯৭১-৭২ সালের রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাব মতে ৫ লাখ টাকার কম পুঁজিওয়ালা কম্পানিগুলোর গড়পড়তা লাভ হয়েছিল শতকরা ৩ টাকা ৭০ পয়সা করে। বড় কম্পানিগুলোর লাভ যেখানে হয়েছিল ৯ টাকা ৯০ পয়সা করে। অর্থাৎ বড় পুঁজিপতিরা তাদের টাকার জোরে একচেটিয়া অধিকারের জোরে ছোট পুঁজিপতিদের তুলনায় তিনগুণ বেশী লাভ করেছিল।

পুঁজিপতিদের ভেতর শুধু যে বড় পুঁজিপতিদের সঙ্গে ছোট ছোট পুঁজিপতিদের একটা সংঘাত থাকে তা নয়। তাদের ভেতর যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধনী হয়েছে বা চাষীদের শোষণ করে বা লগ্নি কারবারে পুঁজি বাড়িয়েছে তাদের ভেতরও নানারকম বিরোধ থাকে। যেমন যারা লগ্নি কারবার করে তারা যত বেশী সুদের হার

বাড়ে তত বেশী লাভ করে কিন্তু অন্যান্য পুঁজিপতিদের তাতে লাভের অংশ কমে যায়। আবার কাঁচামালের দাম যদি বাড়ে তবে বড় চাষী, মহাজন ও জমিদার ব্যবসায়ীদের লাভ বাড়ে কিন্তু শিল্পপতিদের অসুবিধা হয়।

সাম্রাজ্যবাদী আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলির সঙ্গে আবার তেমনি দেশীয় শিল্পপতিদের অনেকের প্রতিযোগিতা করতে হয়। ফলে পুঁজিপতিদের একটা দল যেমন তাদের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে লাভের একটা অংশ পেয়ে খুশী থাকে, তেমনি আর একটা অংশ তাদের বিরোধিতাও করে। বড় বড় সরকারী কর্মচারী, বড় বড় পুঁজিপতি, ব্যবসায়ী, লগ্নিকারী ও জমিদার শ্রেণীর পুঁজিপতিরাই তাদের সঙ্গে বেশী সহযোগিতা করে। কেন না বসে বসে তাদের স্বভাবসুলভ উপায়ে শুধু কিছু টাকা খাটিয়ে একটা মোটা লাভের অংশ ভোগ করার সুবিধা আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলো তাদের দেয়। শুধু রাজনৈতিক নেতাদের ও সরকারী বড় কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার কাজে আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলো তাদের ব্যবহার করে; উৎপাদনের ঝক্কি ও মাল বিক্রির ঝামেলা তাদের পোয়াতে হয় না; সে কাজটা তারা বিদেশী কর্মকর্তাদের উপর ছেড়ে দেয়। কিন্তু যে পুঁজিপতিরা বিদেশী আন্তর্জাতিক কম্পানির সাহায্য ছাড়া নিজেদের নেতৃত্বে স্বাধীনভাবে কল-কারখানা খুলে উৎপাদন চালু করে তাদের সঙ্গে বিদেশী আন্তর্জাতিক কম্পানি ও তাদের সহযোগীদের প্রতিযোগিতা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীর ভেতরেও কিছু কিছু লোককে আন্তর্জাতিক কম্পানিগুলোর বিরোধিতা করতে দেখা যায়। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যদি শ্রমিক কৃষকরা সংগ্রামশীল শক্তিশালী ও দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারে তাহ'লেই ছোট ছোট পুঁজিপতিরা ও এই স্বাধীনচেতা বুর্জোয়া শ্রেণীর কেউ কেউ তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারে। কিন্তু এই আন্দোলনের নেতৃত্ব

যদি শ্রমিক কৃষক শ্রেণীর সংগঠনগুলির হাতে না থেকে বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকদের হাতে থাকে তাহলে ঐসব লোকেরা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিয়ে আন্দোলনকে মাঝ পথে ঠেকিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনাই খুব বেশী থাকে।

বস্তুতঃ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন যে আজ অবধি এই একটা মাঝপথে থেমে রয়েছে এবং সাধারণ মানুষ ও কৃষক শ্রমিকরা যে এই স্বাধীনতা থেকে বিশেষ কিছু সুবিধা লাভ করতে পারেনি তার প্রধান কারণ হল বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতাদের হাতে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব থাকার জন্য। দরিদ্র চাষী মজুর ও মধ্যবিত্ত লোকদের দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া ও দেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ আজ একই সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। দেশের মুক্তিযুদ্ধে যেমন দেশের লোক সাড়া দিয়েছিল, আজ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামেও দেশের লোক নিশ্চয়ই সাড়া দেবে। দেশে এই জাগরণ আনতে গেলে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ক্ষেতমজুর, ছোট ও মাঝারি চাষী, কল মজদুর ও নিম্নমধ্যবিত্ত ছোট চাকুরীজীবী ও ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের দৃঢ় সংগঠন। এই সংগঠন-গুলো দানা বেঁধে উঠলে তাদের ঘিরে ভারতের জনগণও জেগে উঠবে।

দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে এমন নীতি অনুসরণ না করা যাতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শ্রেণীগুলি নিজেদের ভেতর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। আমরা দেখেছি বুর্জোয়া শ্রেণীর ভেতরও এমন একটা অংশ আছে যারা বড় বড় একচেটিয়া ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের দ্বারা শোষিত হয়। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে এরকম কোন দাবী তোলা উচিত হবে না যাতে এই অংশটা সামাজ্যবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে যোগ দেয় এবং তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর বিরোধিতা করে। তাদের শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত করে

রাখতে পারলে অনেক সহজে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকে পরাজিত করতে পারা যাবে।

সুতরাং ভারতে সমাজতন্ত্রের পথে দ্রুত উন্নতি যারা কামনা করে তাদের দরকার প্রথমতঃ শ্রমিক-কৃষকদের এক ঐক্যবদ্ধ দৃঢ় আন্দোলন সৃষ্টি করা এবং এই আন্দোলন ও সংগঠনকে কেন্দ্র করে সমাজের অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদ বিরোধী শ্রেণীগুলিকে সংঘবদ্ধ করা।
